

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০১ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: ভূমিকা

টপিক ০২: পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ

টপিক ০৩: পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা

টপিক ০৪: পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

টপিক ০৫: রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

টপিক ০৬: ভাষা আন্দোলনের কারণ

টপিক ০৭: ভাষা শহীদদের পরিচয়

টপিক ০৮: শহীদ মিনার

টপিক ০৯: ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও অবদান

টপিক ১০: ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

টপিক ১১: যুক্তফ্রন্ট গঠনের রাজনৈতিক পটভূমি

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি

টপিক ১৩: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

টপিক ১৪: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব

টপিক ১৫: নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ

টপিক ১৬: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, ১৯৫৪

টপিক ১৭: আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা

টপিক ১৮: ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান

টপিক ১৯: পাকিস্তান সংবিধানের কার্যকারিতা ও এর ব্যর্থতার কারণ

টপিক ২০: ইক্সান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক শাসন জারি

টপিক ২১: ইক্সান্দার মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

টপিক ২২: আইয়ুব খানের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিদ্বেষ

টপিক ২৩: শরীফ শিফা কমিশন বিরোধী আন্দোলন

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ২৪: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

টপিক ২৫ : ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি বা দাবি

টপিক ২৬: আগরতলা মামলা এবং বাঙালির বিক্ষোভ

টপিক ২৭: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

টপিক ২৮: জেনারেল ইয়াহিয়ার আইনগত কার্তামো আদেশ

টপিক ২৯: ১৯৭০ এর নির্বাচন

টপিক ৩০: ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের কারণ

টপিক ৩১: ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

টপিক ৩২: মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা

টপিক ৩৩: ২৫ মার্চের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

টপিক ৩৪: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

টপিক ৩৫: স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ৩৬: যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি

টপিক ৩৭ : বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ

টপিক ৩৮: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠন

টপিক ৩৯: মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা

টপিক ৪০: মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত, অনিয়মিত ও আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ

টপিক ৪১: চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

টপিক ৪২: মুক্তিযুদ্ধে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

টপিক ৪৩: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

টপিক ৪৪: মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা

টপিক ৪৫: বুদ্ধিজীবী হত্যা

টপিক ৪৬: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ৪৭: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: ভূমিকা

This Topic is important for



MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের জন্ম হয়। 'ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ' ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলভিত্তি। পাকিস্তান রাষ্ট্রকে 'যুক্তরাষ্ট্র' বলা হলেও শুরু থেকেই প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়নি। সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও কোনোদিনই প্রকৃত অর্থে তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে যথাসময়ে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে 'যুক্তফ্রন্ট' ক্ষমতাসীন হলেও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' বিকশিত হতে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট পাহাড়সম বৈষম্য উভয় প্রদেশের জনগণের মধ্যে সন্দেহের বীজ বপন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান '৬ দফা' কর্মসূচি ঘোষণা করলে তা 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'কে আরো সুদৃঢ় করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো সুদৃঢ় হয় এবং তাঁরই আহ্বানে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০২ পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ

টপিক ০২: **পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ**

This Topic is important for



MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' (Two Nation's Theory) ভিত্তিতে 'পাকিস্তান' নামক একটি রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়। এক হাজার মাইলেরও অধিক দূরত্ব ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে। পাকিস্তানের উভয় অংশের মাঝখানে ছিল ভারত ভূখণ্ড। জনসংখ্যার দিক থেকে পূর্ব বাংলার জনসংখ্যার পরিমাণ ছিল মোট জনসংখ্যার ৫৬.২৭%, পাঞ্জাব ১৮.৮২%, সিন্ধু ৪.৬১%, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ২.২২%, বেলুচিস্তান ০.৬০% এবং দেশীয় রাজ্যসহ অন্যান্য অঞ্চল ৬.৩৪%। আবার মোট ভূখণ্ডের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৮৪.৩৬% এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ১৫.৬৪%। পাকিস্তানের দুই অংশের জনগণের মধ্যে ছিল ব্যাপক অমিল। পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে আর্থ-সামাজিক পার্থক্য খুব বেশি না থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানে তা' ছিল খুবই প্রকট। ধর্মভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদ ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির মূলভিত্তি।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে (Constituent Assembly) উলেমা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বকারী সদস্যগণ দাবি করেন যে, পাকিস্তানকে এমন একটি 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' (Islamic Republic) ঘোষণা করা হোক যেখানে কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে রাষ্ট্র শাসিত হবে এবং রাষ্ট্রপ্রধানকে আমীর বা খলিফার মতো অসীম ক্ষমতা দেয়া হোক। কিন্তু তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকারের অধিকাংশ পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রে দীক্ষিত সদস্যগণ 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' নামকরণ সমর্থন করলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রকে আধুনিক গণতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে আগ্রহী ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্র যে একটি আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে সে সম্পর্কে তাঁর প্রদত্ত ভাষণে স্পষ্ট করে বলেছিলেন। ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে প্রস্তাব (আদর্শ প্রস্তাব) গৃহীত হয় সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছিল যে, পাকিস্তান হবে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যেখানে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশের শাসন পরিচালনা করবে। পাশাপাশি বলা হয় যে, ইসলাম নির্দেশিত গণতন্ত্র, সামাজিক ন্যায়বিচার, সহনশীলতা, স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতি পুরোপুরি মেনে চলা হবে। মুসলমান জনগণকে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত শিক্ষা ও বিধি-বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের সুযোগ দেয়া হবে। পাকিস্তানের ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালে প্রণীত সংবিধানেও পাকিস্তানকে একটি 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করা হয়।

পাকিস্তান ছিল একটি 'যুক্তরাষ্ট্র'। এ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবার কথা ছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবের মূল কথাই ছিল 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'। কিন্তু পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ছিল না। বরং স্বায়ত্তশাসনের দাবি উচ্চারিত হলেই এর প্রবক্তাদের 'রাষ্ট্রদ্রোহী' এবং 'ভারতের এজেন্ট' বা গুপ্তচর বলে প্রচার করা হতো। স্বায়ত্তশাসনকামী বাম দলগুলোকে বলা হতো 'নাস্তিক', 'খোদাদ্রোহী'। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন না থাকায় পাকিস্তান প্রকৃত অর্থে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্রে 'সংসদীয় গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও প্রকৃত অর্থে তা' হয়ে ওঠেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ গভর্নর জেনারেল হন। সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তাঁর থাকার কথা ছিল। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, তাঁর আচরণ ছিল প্রকৃত শাসক বা সরকার প্রধানের মতো। মন্ত্রিসভার সদস্য এবং আমলাগণ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের পরিবর্তে গভর্নর জেনারেল মি. জিন্নাহ্ প্রতি অনুগত ও মুখাপেক্ষী ছিলেন। পরবর্তী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সংসদীয় রীতিনীতির প্রতি ছিলেন আরো বেশি বীতশ্রদ্ধ ও অনুদার। ফলে পাকিস্তানে কোনোদিনই প্রকৃত অর্থে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

পাকিস্তানে যথাসময়ে কোনো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। গণপরিষদ সদস্যগণের অনেকের মৃত্যু এবং ভারতে চলে যাবার কারণে আসন শূন্য হলে প্রথমে ২/১টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেসব আসনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি ঘটে। ফলে মুসলিম লীগ সরকার আর উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের ঝুঁকি গ্রহণ করেনি। ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে 'যুক্তফ্রন্ট' বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ও পাঞ্জাবি সামরিক-বেসামরিক আমলাচক্র তা মেনে নিতে পারেনি। তারা পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করে। তারা যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধান শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে 'ভারতের চর' ও রাষ্ট্রদ্রোহী' আখ্যা দেয়।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের দু অংশের জনগণের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবস্থানের মধ্যে ব্যাপক অমিল ছিল। এছাড়াও পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো শুরু থেকে না ছিল ইসলামি, না ছিল গণতান্ত্রিক। এটি ছিল এমন একটি রাষ্ট্র, যা ছিল স্বৈরাচারী ও কুচক্রী শাসকদের দ্বারা পরিচালিত। পাকিস্তান রাষ্ট্র শুরু থেকেই ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নগ্নভাবে ব্যবহার করেছিল। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রটি 'জাতীয় সংহতি' অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০৩ পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা

টপিক ০৩: **পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিদের অবস্থা**

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারের অবাঙালি রাজনৈতিক নেতা ও সামরিক-অসামরিক আমলাগণ পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। ১৯৪৮ সাল থেকে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ কতিপয় অবাঙালি নেতার পকেট-সংগঠনে পরিণত হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বের উচ্চ পর্যায়ে বাঙালি নেতাগণ যেন অধিষ্ঠিত না হতে পারেন সে জন্য চক্রান্ত চলতে থাকে প্রথম থেকেই। পূর্ব বাংলার যে ২/১ জন রাজনৈতিক নেতা রাষ্ট্র পরিচালনার শীর্ষে অধিষ্ঠিত হন তাঁরা প্রায় সকলেই ছিলেন উর্দুভাষী।

১৯৪৮ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলাকে একটি উপনিবেশ বানানোর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন শাসকগোষ্ঠী।

এ কাজে তাদেরকে সলাপরামর্শ ও কূটবুদ্ধি দিয়ে সহযোগিতা করতে থাকে পাঞ্জাবি ও ভারত থেকে চলে আসা উর্দুভাষী সামরিক ও বেসামরিক আমলারা। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমগ্র পাকিস্তানের শতকরা ৫৬.৪০% ভাগ মানুষের মুখের ভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে (মোট জনসংখ্যার ৩.২৭%) রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে বাঙালি জনগণ বিশেষ করে ছাত্র-যুবসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বুকের তাজা রক্ত দিয়ে তারা পাকিস্তান সরকারের হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানায়। সরকারের অগণতান্ত্রিক ও স্বৈচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী চেতনার সৃষ্টি করে। এ সময় শাসকশ্রেণি প্রচার করে যে, ভাষা আন্দোলনকারীরা ভারতের এজেন্ট বা চর এবং তারা ইসলাম ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের দূশমন, তারা দেশদ্রোহী। ১৯৫৪ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচনে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে 'যুক্তফ্রন্ট' সরকার গঠন করলে চক্রান্ত করে সে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

শেরে বাংলাকে 'ভারতের চর' এবং 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেয়া হয়। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন শুরু করলে তাকেও 'ভারতের চর' এবং 'দেশদ্রোহী' ঘোষণা করা হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান, বাঙালিদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন বন্ধ এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন শুরু করলে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও শেখ মুজিবুর রহমানকে 'ভারতের চর' ও 'দেশদ্রোহী' আখ্যা দেয়া হয়। ১৯৬৬ সালে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তিসনদ '৬ দফা কর্মসূচি' ঘোষণা করলে এবং দ্রুত তা জনপ্রিয় হয়ে উঠলে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা 'আগরতলা মামলা' সাজানো হয় এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার নীল নকশা রচনা করা হয়।

এভাবে যখনই বাঙালি কোন নেতা বা প্রগতিশীল লেখক-বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানি শাসকদের অত্যাচার-নিপীড়নের কথা বলতে গেছেন, যখনই তাঁরা বাঙালিদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্য সোচ্চার হয়েছেন, পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের উপনিবেশ বানানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তখনই তাঁদের উপর নেমে এসেছে জেল-জুলুম ও অত্যাচার-নিপীড়ন। অকুতোভয়, সাহসী বাঙালি রাজনৈতিক নেতা এবং লেখক-বুদ্ধিজীবীদের আখ্যায়িত করা হয়েছে 'ভারতের চর', 'রুশ-ভারতের দালাল', 'দেশদ্রোহী' এবং 'ইসলামের দুশমন' বলে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০৪ পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

টপিক ০৪: পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ

১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন অনুসারে পাকিস্তানে সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি 'গণপরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে নির্বাচিত যে সব সদস্যের নির্বাচনি এলাকা পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমানায় পড়ে তাদের ভোটে গণপরিষদের সদস্য মনোনীত হন। দশ লক্ষ লোকের জন্য একজন গণপরিষদ সদস্য মনোনীত হন। সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত গণপরিষদ কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কাজ করে। প্রথম গণপরিষদের প্রথম বৈঠক বসে ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট। শুরুতে প্রথম গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৯ জন। পরবর্তীতে দেশীয় রাজ্য এবং উপজাতীয় অঞ্চল থেকে ১০ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৭৯ জনে। গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৪ জন। পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের মধ্যে গণপরিষদের আসন বণ্টন ছিল নিম্নরূপ :

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ

প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের নাম	আসন সংখ্যা
পূর্ব বাংলা	৪৪
পাঞ্জাব	২২
সিন্ধু	৫
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	৩
বেলুচিস্তান রাজ্য ইউনিয়ন	১
বেলুচিস্তান	১
ভাওয়ালপুর	১
খয়েরপুর	১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশীয় রাজ্যসমূহ	১
	মোট = ৭৯

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ

১৯৪৭ সালে প্রথম গণপরিষদে মুসলিম লীগ দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৯ জন এবং কংগ্রেস দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৬ জন। কিন্তু ১৯৫৩ সালে মুসলিম লীগের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬০ জনে এবং কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা কমে গিয়ে দাঁড়ায় ১১ তে। শুরুতে মোট ৬৯ জন গণপরিষদ সদস্যের মধ্যে পূর্ব বাংলার সদস্য ছিল ৪৪ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্য সংখ্যা ছিল ২৫ জন। ভারত বিভাগের পর বিপুল সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে চলে আসায় তাদের প্রতিনিধিত্বের জন্য ৬ জন সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এর মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাব প্রদেশের জন্য ৫টি এবং সিন্ধুর জন্য ১টি আসন বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া কয়েকটি দেশীয় রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দিলে তাদের জন্যও ৪টি আসন বৃদ্ধি করা হয়। এভাবেই প্রথম গণপরিষদের সদস্যসংখ্যা বেড়ে ৭৯ জনে দাঁড়ায়। উল্লেখ করা যায় যে, গণপরিষদের আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব বাংলার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। প্রথম গণপরিষদের প্রথম বৈঠক বসে করাচিতে। ১৯৪৭ সালের ১০ আগস্ট মি. যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডলকে অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এরপর ১১ আগস্ট মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ গণপরিষদের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন জনাব তমিজ উদ্দিন খান। গণপরিষদে ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ ২৫ সদস্যবিশিষ্ট 'মূলনীতি কমিটি' গঠিত হয়।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ

১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'মূলনীতি কমিটির' 'অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট' গণপরিষদে পেশ করা হয়। এ রিপোর্টে একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন, কেন্দ্রীয় আইনসভার নিম্নকক্ষে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রদেশগুলোকে প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার প্রদান, কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে বিভিন্ন প্রদেশকে সম-প্রতিনিধিত্ব প্রদান প্রভৃতি প্রস্তাবসহ অনেকগুলো সুপারিশ করা হয়। 'অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টের' সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত ও সমালোচিত বিষয় ছিল একমাত্র উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ। এ রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে আইনসভায় বাঙালি জনগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হতো। এর ফলে এ রিপোর্ট প্রকাশিত হলে বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে।

১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর 'মূলনীতি কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট' গণপরিষদে পেশ করা হয়। এ রিপোর্টের প্রধান বিষয় ছিল 'সংখ্যাসাম্য নীতি' প্রবর্তন। এতে বলা হয় যে, কেন্দ্রীয় আইন সভায় উচ্চকক্ষের আসন সংখ্যা হবে ১২০। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৬০টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বাকি ৬০টি আসন নির্দিষ্ট থাকবে। আইনসভার নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যা হবে ৪০০। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান হতে ২০০ জন এবং পশ্চিম পাকিস্তান হতে বাকি ২০০ জন নির্বাচিত হবেন। পূর্ব পাকিস্তান হবে একটি ইউনিট। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত হবে।

পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদ

দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে কতগুলো সিদ্ধান্তে পৌঁছেন। তাঁর এ সিদ্ধান্তগুলো রিপোর্ট আকারে ১৯৫৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর গণপরিষদে পেশ করা হয়। 'মোহাম্মদ আলী ফর্মুলায়' বলা হয় - যে, আইনসভার নিম্নকক্ষে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করবে এবং উচ্চকক্ষে পশ্চিম পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করবে। তবে উভয় কক্ষে যৌথ আসনের ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমান প্রতিনিধিত্ব থাকবে। পাকিস্তানের উভয় অংশের জনগণের মধ্যে সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এ ফর্মুলায় 'সমতার নীতির' উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়। কিন্তু উচ্চকক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কম আসন নির্ধারণ করায় এবং ভাষা সমস্যা সমাধানের কোনো ইঙ্গিত প্রদান না করায় বাঙালি জনগণ এ ফর্মুলাকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি।

'মূলনীতি কমিটির রিপোর্ট' ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গণপরিষদে গৃহীত হয়। এ সময়ে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের প্রভুসুলভ আচরণে এবং অযাচিত ও অনুচিত হস্তক্ষেপের ফলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও গণপরিষদ অধৈর্য ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। গোলাম মোহাম্মদ দেশের বাইরে থাকার সময় গণপরিষদ ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মন্ত্রিপরিষদ ও আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা সীমিত করার একটি উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশে ফিরে এসে গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের ২৪ অক্টোবর সারাদেশে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করেন এবং গণপরিষদ বাতিল করেন।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ

খ. দ্বিতীয় গণপরিষদ: গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৫ সালে এক 'অধ্যাদেশ' বলে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ গঠন করেন। দ্বিতীয় গণপরিষদ মোট ৮০ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়। তাঁদের অর্ধেক অর্থাৎ ৪০ জন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। বাকি ৪০ জন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের আইনসভা দ্বারা -নির্বাচিত হন। পূর্ব পাকিস্তানের উপর সংখ্যাসাম্য নীতি চাপিয়ে দেওয়া হয়। অথচ এ প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশি। সংখ্যাসাম্য নীতি প্রণয়ন করে প্রকৃত অর্থে পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু জনসংখ্যাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। এজন্যই শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক দ্বিতীয় গণপরিষদ বর্জন করার হুমকি প্রদান করেন। তবে পূর্ব পাকিস্তানে 'গভর্নরের শাসন' তুলে নেয়ায় তিনি সংখ্যাসাম্য নীতি মেনে নেন। দ্বিতীয় গণপরিষদে কোনো রাজনৈতিক দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় স্থিতিশীল সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি।

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ

দলীয় ভিত্তিতে দ্বিতীয় গণপরিষদে পূর্ব বাংলার সদস্য সংখ্যা

রাজনৈতিক দলের নাম	সদস্য সংখ্যা
ফ্রন্ট	১৬
আওয়ামী লীগ	১২
কংগ্রেস	৪
তফসিলী সম্প্রদায় ফেডারেশন	৩
ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি	২
কমিউনিস্ট পার্টি	১
মুসলিম লীগ (প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী)	১
স্বতন্ত্র	১
সর্বমোট =	৪০

পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদ

পাকিস্তান দ্বিতীয় গণপরিষদে দলীয় ভিত্তিতে সদস্য সংখ্যা

রাজনৈতিক দলের নাম	সদস্য সংখ্যা
মুসলিম লীগ	২৫
যুক্তফ্রন্ট	১৬
আওয়ামী লীগ	১৩
কংগ্রেস	৪
তফসিলি সম্প্রদায় ফেডারেশন	৩
ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি	২
অন্যান্য/স্বতন্ত্র	১৬
কম্যুনিষ্ট পার্টি	১
সর্বমোট =	৮০

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০৫ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

টপিক ০৫: পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিত্ব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

ক. ১৯৪৮ সাল পর্যায়: পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের শুরু থেকেই। ১৯৪৭ সালের ১৮ মে হায়দারাবাদে অনুষ্ঠিত 'উর্দু সম্মেলনে' এবং ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করা হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পাঞ্জাবি আমলা নিয়ন্ত্রিত মুসলিম লীগ সরকার অফিস-আদালতের পাশাপাশি খাম, পোস্টকার্ড প্রভৃতি জিনিষেও শুধুমাত্র ইংরেজি ও উর্দু ভাষা ব্যবহার শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ৩ সদস্যবিশিষ্ট “তমুদ্দন মজলিস” ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাশেমের তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে “পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু” শীর্ষক প্রকাশিত একটি পুস্তিকায় বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আহ্বান জানানো হয়। ১৯৪৭ সালের শেষদিকে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম সামসুদ্দীন, ড. এনামুল হক প্রমুখও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জোরালো দাবি নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধ রচনা করেন।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

১৯৪৮ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত উর্দুর সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব রাখেন। তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করায় তা অগ্রাহ্য হয়ে যায়। এর প্রতিবাদে তমুদ্দন মজলিসের উদ্যোগে 'রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি সমগ্র পূর্ববাংলায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে 'হরতাল' পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিক্ষক এবং বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের এক প্রস্তাবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য 'সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন শামসুল হক। গণপরিষদে ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ায় ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ঢাকা শহরে ছাত্রসমাজ 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালন করে। তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকার শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান ও অলি আহাদসহ অনেক ছাত্রনেতা ও বুদ্ধিজীবীকে গ্রেপ্তার করে।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে তৃতীয় সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সফরে আসেন। ২১ মার্চ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় তিনি বলেন যে, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোনো ভাষা নয়'। ২৪ মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি আবারো জোর দিয়ে বলেন যে, "উর্দু এবং শুধু উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" জিন্নাহ সাহেবের ঐ ঘোষণার প্রতিবাদে সমাবর্তন সভায় উপস্থিত ছাত্ররা 'না' 'না' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। ৩ জিন্নাহ সাহেবের এ উক্তি ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্র অসন্তোষের মুখে ছাত্র নেতাদের সাথে একটি ৮-দফা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এতে বলা হয় যে, পূর্ব বাংলায় ইংরেজির স্থলে বাংলাকে সরকারি ভাষা ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হবে। চিন সেকটমিয়াম

১৯৪৮ সালের পর থেকে শুরু হয় নতুন ষড়যন্ত্র। বাংলা হরফ পরিবর্তন করে আরবি হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা করা হয়। ১৯৫০ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকারের 'ভাষা কমিটির রিপোর্টে' পূর্ব বাংলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উর্দুকে দ্বিতীয় ভাষারূপে পাঠ করার সুপারিশ করা হয়। এর ফলে বাঙালি জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

খ. ১৯৫২ সাল পর্যায় : ১৯৫০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান কর্তৃক গণপরিষদে পেশকৃত 'মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে' উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উল্লেখ করায় পূর্ব বাংলার জনগণ এবং গণপরিষদের বাঙালি সদস্যগণ বিক্ষুব্ধ হন। কেননা ১৯৫১ সালে ভাষার ভিত্তিতে পাকিস্তানের জনগণের শতকরা হার ছিল নিম্নরূপ

১৯৫১ সালে পাকিস্তানে বিভিন্ন ভাষার জনসংখ্যার শতকরা হার			
ভাষা	পূর্ব বাংলা	পশ্চিম পাকিস্তান	পাকিস্তান
বাংলা	৯৮.১৬	০.০২	৫৬.৪০%
পাঞ্জাবি	০.০২	৬৭.০৮	২৮.৫৫%
সিন্ধি	০.০১	১২.৮৫	৫.৪৮%
পশতু	-	৮.১৬	৩.৪৮%
উর্দু	০.৬৮	৭.০৫	৩.৩৭%
বেলুচি	-	৩.০৮	১.২৯%
ইংরেজি	০.০১	০.০৩	০.০২%
অন্যান্য	১.১৬	১.৭৭	১.৪২%
সর্বমোট	১০০	১০০	১০০.০০

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

মিছিলটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এলে পুলিশ ও ই. পি. আর. নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বরকত, তেজোদ্দীপ্ত তরুণ সালাম ও আব্দুল জব্বার এবং বাদামতলী কমাশিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক। এছাড়া ১৭ জন ছাত্র-যুবক আহত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর রহমান (শফিক বলে পরিচিত), রিক্সাচালক আউয়াল এবং নাম না জানা এক কিশোর। ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়। পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্য মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্য জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন এ নির্লজ্জ, পাশবিক পুলিশি হামলার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে সেদিনই পদত্যাগ করেন।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহীদ মিনার-যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন 'আজাদ' সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন। শহীদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির তীর্থ কেন্দ্র। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার ঐ দিনই অপরাহ্নে শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। কিন্তু বাঙালির হৃদয়ে যে স্মৃতির মিনার গাঁথা হয়েছিল তা মুছে যায়নি, রাঙা হৃদয়ের বর্ণমালায় তা আজো সমুজ্জ্বল রয়েছে।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি নিখিল পাকিস্তান মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে এবং পল্টন ময়দানের জনসভায় পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।' এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ৩০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। ৩১ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে সর্বদলীয় কর্মীসমাবেশে সকল রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে একটি 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ' গঠিত হয়। এ সভায় স্থির হয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করা হবে। ২১ ফেব্রুয়ারি দিবসের কর্মসূচিকে সফল করে তোলার জন্য ৪ ফেব্রুয়ারি 'হরতাল' এবং ১১ ও ১৩ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সাথে 'পতাকা দিবস' পালিত হয়। কারাগারে আটক অবস্থায় ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা' ও 'বন্দী মুক্তির' দাবিতে আওয়ামী লীগ নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মহিউদ্দিন আহমদ আমরণ অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। নূরুল আমীনের ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকে ঢাকা শহরে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে এবং সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ছোট ছোট শোভাযাত্রাসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরনো কলাভবন প্রাঙ্গণে মিলিত হয়।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের আমতলায় যে ঐতিহাসিক সভা শুরু হয় সেখানে ছাত্রনেতা আবদুল মতিনের প্রস্তাবে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে শোভাযাত্রাসহ মায়ের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি পেশ করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে (বর্তমান জগন্নাথ হল মিলনায়তনে) যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের বাইরে সশস্ত্র পুলিশ প্রহরা ভেদ করে অসংখ্য দলে বিভক্ত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা শান্তিপূর্ণভাবে এগিয়ে চলতে থাকে। মুখে ছিল তাদের 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান। পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে ছাত্রদের দশজনের খণ্ড মিছিল পরিষদ ভবনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। শান্তিপূর্ণ এ মিছিলটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এলে পুলিশ ও ই. পি. আর. নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ ছাত্র মিছিলে লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে নিহত হন এম. এ. ক্লাসের ছাত্র বরকত, তেজোদ্দীপ্ত তরুণ সালাম ও আব্দুল জব্বার এবং বাদামতলী কমার্শিয়াল প্রেসের মালিকের ছেলে রফিক। এছাড়া ১৭ জন ছাত্র-যুবক আহত হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারাদেশে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র, শ্রমিক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও সাধারণ জনতা পূর্ণ হরতাল পালন করে এবং সভা-শোভাযাত্রাসহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে। ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদ হন শফিউর রহমান (শফিক বলে পরিচিত), রিক্সাচালক আউয়াল এবং নাম না জানা এক কিশোর। ২৩ ফেব্রুয়ারি ফুলবাড়িয়ায় ছাত্র-জনতার মিছিলেও পুলিশ অত্যাচার-নিপীড়ন চালায়।

আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়

পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্য মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ এবং আজাদ পত্রিকার সম্পাদক ও ব্যবস্থাপক পরিষদ সদস্য জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন এ নির্লজ্জ, পাশবিক পুলিশি হামলার প্রতিবাদে মুসলিম লীগ সংসদীয় দল থেকে সেদিনই পদত্যাগ করেন। ভাষা আন্দোলনের শহীদ স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রাতারাতি ছাত্রদের দ্বারা গড়ে ওঠে শহীদ মিনার-যা ২৪ ফেব্রুয়ারি উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা। ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন 'আজাদ' সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন। শহীদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির তীর্থ কেন্দ্র। প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ সরকার ঐ দিনই অপরাহ্নে শহীদ মিনারটি ভেঙে ফেলে। কিন্তু বাঙালির হৃদয়ে যে স্মৃতির মিনার গাঁথা হয়েছিল তা মুছে যায়নি, রাঙা হৃদয়ের বর্ণমালায় তা আজো সমুজ্জ্বল রয়েছে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০৬ ভাষা আন্দোলনের কারণ

টপিক ০৬: **ভাষা আন্দোলনের কারণ**

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে এ নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় ১৯৪৭ সালের পূর্ব থেকেই। তবে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম ভাষা এবং রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উত্থাপিত হয়। মাতৃভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হয়। এ আন্দোলন দমনের জন্য তদানীন্তন মুসলিম লীগ সরকার দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫২ সালের একুশ, বাইশ ও তেইশ তারিখে প্রাণ দিতে হয় কতিপয় কিশোর যুবককে। মাতৃভাষার দাবিতে গড়ে ওঠা এ আন্দোলনই 'ভাষা আন্দোলন'। ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিল নিম্নলিখিত কারণে :

১. অবাঙালি নেতাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীয়করণ: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হলে এর পরিচালনার ক্ষমতা চলে যায় অবাঙালিদের হাতে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান তথা গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান ছিলেন অবাঙালি। প্রধান প্রধান মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব প্রদান করা হয় অবাঙালি মন্ত্রীদের। কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে (আই.সি.এস; আই.পি.এস প্রভৃতি) ছিলেন অবাঙালি। ব্যবসা-বাণিজ্য চলে যায় সম্পূর্ণরূপে অবাঙালি ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের হাতে। এমনকি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় জন্মগ্রহণ করলেও তিনি ছিলেন অবাঙালি। যে দু'চারজন বাঙালি নেতা ক্ষমতার কিছুটা স্বাদ নিতে পেরেছিলেন তারাও ছিলেন অবাঙালি নেতাদের তোষামোদকারী ও চাটুকার। ফলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে অবাঙালি নেতাদের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় বাঙালি জনগণ ধীরে ধীরে সন্ধিগ্ন ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে থাকে।

২. শুরুতেই বাঙালিদের প্রতি অবহেলা: ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসেই বাঙালি জনগণ লক্ষ্য করে যে, অফিস- আদালতের পাশাপাশি ডাকটিকেট, পোস্টকার্ড, খাম, রেলের টিকেট প্রভৃতিতে ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ নভেম্বর সিভিল সার্ভিসের একটি পরীক্ষার জন্য উর্দু, হিন্দি, ইংরেজি, জার্মান, ফ্রেঞ্চসহ নয়টি ভাষা ব্যবহারের অনুমতি দিলেও বাংলাকে বাদ দেয়া হয়। অথচ ইংরেজি ও উর্দু দুটি ভাষা পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা ছিল না। কেননা ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬.৪০ ভাগ মানুষ বাংলায় যখন কথা বলতো তখন মাত্র ৩.৩৭ ভাগ মানুষ উর্দুতে কথা বলতো। আর ইংরেজি ছিল এক সময়ের ব্রিটিশ শাসকদের ভাষা এবং মাত্র ০.০২ ভাগ মানুষ ইংরেজিতে কথা বলতো। শুরুতেই ভাষার প্রশ্নে এ অবহেলা ও উপেক্ষা সচেতন বাঙালিদের মনে আঘাত দেয়।

৩. ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান: ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি কংগ্রেস দলীয় গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ২৫ তারিখ এ প্রস্তাবের ওপর আলোচনা শুরু হলে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান, পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন এবং গণপরিষদের সহ-সভাপতি মৌলভী তমিজউদ্দীন খান (ফরিদপুর) ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের আনীত প্রস্তাবের কড়া সমালোচনা করেন। শুধু বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের অন্যতম সরকারি ভাষা করার প্রস্তাবই লিয়াকত আলী খান প্রমুখ প্রত্যাখ্যান করেনি, বরং এসব কুচক্রী নেতা ধীরেন্দ্র নাথ দত্তকে মুসলমানের শত্রু, পাকিস্তানের শত্রু ও উগ্র হিন্দু বলে আক্রমণ করে বক্তব্য রেখেছিলেন। এর ফলে বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১১ মার্চ (১৯৪৮) ঢাকা শহরে ছাত্রসমাজ প্রতিবাদ সভা, সাধারণ ধর্মঘট ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। পুলিশ ছাত্রদের উপর বেপরোয়া লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এমনকি বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করে। মুসলিম লীগ সরকার ছাত্রদের ওপর গুলীদেরকে লেলিয়ে দেয়। ফলে সারাদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৪. লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের লেখনী: লেখক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন ব্রিটিশ শাসনামল থেকেই। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১৯১৮ সালেই বাংলাকে তৎকালীন ভারতের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। ১৯২১ সালে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা ভাষাকে অবিভক্ত বাংলার রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকারের কাছে। ১৯৩৭ সালে 'দৈনিক আজাদ' পত্রিকা 'ভারতের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশ করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়া উদ্দিন ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করলে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর প্রতিবাদে দৈনিক আজাদে একটি প্রবন্ধে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৪৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর 'তমুদ্দন মজলিস' প্রকাশিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু' শীর্ষক পুস্তিকায় ড. কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও অধ্যাপক আবুল কাশেম বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের জোরালো যুক্তি পেশ করেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'সাহিত্য সম্মেলনে' সভাপতির ভাষণে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাঙালির আত্মপরিচয় ও নিজস্ব সংস্কৃতি সম্পর্কে বলেন যে, "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি।

৫. আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব: বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবাঙালি পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। বাঙালি শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানও ক্ষমতার লোভে এ ঘৃণ্য চক্রান্তের শরিক হন। এ সময় বাংলা ভাষাকে 'পাকিস্তানিকরণ' ও 'ইসলামিকরণের' নামে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। এর পাশাপাশি আরবি হরফে বাংলা লেখারও প্রচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান করাচিতে অনুষ্ঠিত 'নিখিল পাকিস্তান শিক্ষক সম্মেলনে' এবং ১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি 'শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের' সভায় আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব পেশ করেন। বাঙালি জনগণ বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে এরূপ ষড়যন্ত্রে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

৬. জিন্নাহর দস্তোক্তি : গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স (ঘোড়দৌড়) ময়দানের জনসভায় এবং ২৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কনভোকেশনে ছাত্র-শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, 'উর্দু এবং একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' (Urdu and only Urdu shall be the state language of Pakistan) | জিন্নাহর এ বক্তব্য পেশের সময় উপস্থিত ছাত্ররা 'না' 'না' ধ্বনি দিয়ে এর প্রতিবাদ জানান। জিন্নাহ এ দস্তোক্তি ছিল অগণতান্ত্রিক। কেননা তিনি ইচ্ছে করেই পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তে এমন একটি ভাষাে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন যা' ছিল সে সময়ে পাকিস্তানের মাত্র ৩.৩৭% ভাগ মানুষের মুখের ভাষা। জিন্নাহ এ ঘোষণায় বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

৭. খাজা নাজিমুদ্দিনের বিশ্বাসঘাতকতা: খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান হলেও ছিলেন অবাঙালি। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে তিনি অবজ্ঞা করতেন। তিনিও জিন্নাহর মতোই উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত বলে মনে করতেন। জিন্নাহ-লিয়াকতের মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫১ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় তিনি জিন্নাহ মতই ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। মূলত খাজা নাজিমুদ্দিনের এ বক্তব্যই বাঙালি জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এর প্রতিবাদে ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট ও সভা সমাবেশ এবং ৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩০ জানুয়ারি ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরিতে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' সভাপতি মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এর ফলে অতি দ্রুত সমগ্র পূর্ববঙ্গে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

৮. প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের ঘোষণা: ১৯৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের অবাঙালি প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান দস্তের সাথে জিন্নাহ মতোই গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। বাঙালি জনগণ এ ঘোষণায় বিক্ষুব্ধ ও মর্মান্বিত হন।

৯. স্বায়ত্তশাসনের চেতনা: পাকিস্তান স্বাধীন হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম মূল দাবি ছিল প্রদেশ ও অঙ্গরাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু পাকিস্তানে প্রদেশগুলোকে কোনো সময়ই স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়নি। এজন্য বিক্ষুব্ধ বাঙালি জনগণ ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে তা সমর্থন করে।

১০. বৈষম্য: পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বৈষম্যও বাঙালি জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। এর ফলে ভাষা আন্দোলন শুরু হলে প্রথমে ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবীগণ এবং ধীরে ধীরে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এতে সমর্থন জানায়। এর ফলে ভাষা আন্দোলন দুর্বীর হয়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০৭ ভাষা শহীদদের পরিচয়

টপিক ০৭: ভাষা শহীদদের পরিচয়

This Topic is important for



MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনে কতজন শহীদ হয়েছিলেন বা আহত হয়েছেন তার সঠিক কোনো হিসাব দেয়া সম্ভব নয়। তবে কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষাৎকার, ২১, ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারির ঘটনাবলি সম্পর্কে বিশেষকরে গুলি বর্ষণে আহত নিহতদের সম্পর্কে দৈনিক আজাদসহ সে সময়ের সংবাদপত্রের সংবাদ এবং আরো পরে ভাষা আন্দোলন নিয়ে লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, গবেষণা থেকে ভাষা শহীদদের নাম ও পরিচয় সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তা নিম্নরূপ :

শহীদ রফিক উদ্দিন আহমদ (রফিক) : বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম শহীদ রফিক উদ্দিন আহমদ রফিক। তিনি মানিকগঞ্জ জেলার সিংগাইর থানার পারিল গ্রামের উত্তর পাড়ায় ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল লতিফ এবং মাতার নাম রাফিজা খাতুন। বাবুবাজার-বাদামতলীর একটি প্রিন্টিং প্রেসের মালিক ছিলেন জনাব আব্দুল লতিফ। রফিক জগন্নাথ কলেজের (মতান্তরে মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের) ছাত্র ছিলেন। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে রফিক তার পিতার কাজে সাহায্য করতেন। একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ লার্গিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। বিকেল সাড়ে তিনটার পর মেডিকেল কলেজের সামনে পুলিশ ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে রফিক ঘটনাস্থলেই সাথে সাথে মারা যান। তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়।

শহীদ আব্দুল জব্বার : ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও উপজেলার পাঁচুয়া (পাঁচাইয়া) গ্রামে ১৯১৯ সালে আব্দুল জব্বার জন্মগ্রহণ করেন। আব্দুল জব্বার ছিলেন পেশায় দর্জি। তাঁর পিতার নাম আব্দুল কাদের। তিনি তাঁর ক্যাসারে আক্রান্ত অসুস্থ শাশুড়িকে নিয়ে এসে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করিয়েছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটার পর পুলিশ ছাত্র-জনতার ওপর গুলি চালালে আব্দুল জব্বার শাহাদাত বরণ করেন। শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৩ বছর। আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

শহীদ আবুল বরকত : শহীদ আবুল বরকত-এর জন্ম ১৯২৭ সালে, পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার বাবলা গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শামসুদ্দোহা। ছোটবেলায় স্থানীয় তালিবপুর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক এবং বহরমপুর কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইন্টারমিডিয়েট পাস করেন। ১৯৪৮ সালে তিনি চলে আসেন ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন বি. এ. অনার্স শ্রেণিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে। ১৯৫১ সালে তিনি অনার্স পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ৪র্থ স্থান অধিকার করে দ্বিতীয় শ্রেণি পান। ১৯৫২ সালে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন এম এ শেষ বর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে। পাতলা, এক হারা এবং লম্বা চেহারার আবুল বরকত ছিলেন শান্ত, নিরীহ ও বিনয়ী। রাজনীতি সচেতন হলেও প্রত্যক্ষ রাজনীতি করতেন না।

২১ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩টার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যখন ছাত্র মিছিলে পুলিশ অতর্কিত লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করছিল তখন তিনি মেডিকেল কলেজ ছাত্রাবাসের শেডের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন। হঠাৎ বিকেল তিনটা-সাড়ে তিনটার পর পুলিশ মরিয়া হয়ে ওঠে এবং গুলিবর্ষণ শুরু করে। ৬ পুলিশের গুলিতে বরকত পড়ে যান। প্রচুর রক্তক্ষরণ হতে থাকে আহত স্থান থেকে। উপস্থিত ছাত্রজনতা আহত বরকতকে মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করায়। ডা. কর্নেল গিয়াস উদ্দিন তাঁর অপারেশন করেন। কিন্তু রাত ৮ টায় চিকিৎসকদের সকল চেষ্টা এবং সহপাঠী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও হাসপাতালে দেখতে আসা হাজারো মানুষের আকুতিকে ব্যর্থ করে দিয়ে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁকে আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়। শাহাদাতবরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৫ বছর।

শহীদ আব্দুস সালাম : ফেনী জেলার লক্ষণপুর গ্রামে জন্ম শহীদ আব্দুস সালামের। শহীদ আব্দুস সালামের পিতার নাম মোহাম্মদ ফাজিল মিয়া। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডাইরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজে পিয়নের চাকরি করতেন। আব্দুস সালাম পুলিশের গুলিতে মেডিকেল কলেজের গেটে আহত হন। গুলিবিদ্ধ আব্দুস সালামকে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়। তিনি ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন ১৯৫২ সালের ৭ এপ্রিল। শহীদ সালাম থাকতেন ঢাকার ২৩/বি নীলক্ষেত ব্যারাকে।

শহীদ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন: শহীদ মোহাম্মদ সালাউদ্দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিলেন। একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৬ বছর।

শহীদ শফিউর রহমান (শফিক ওরফে শফিউর): শহীদ শফিউর রহমান শফিক-এর জন্ম ১৯১৮ সালের জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কোন্সগর গ্রামে। তাঁর পিতার নাম মাহবুবুর রহমান। তিনি হাইকোর্টের একজন কর্মচারী ছিলেন এবং ঢাকার রঘুনাথ দাস লেনে সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস করতেন। পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৩৪ বছর। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে কয়েকজন শহীদ হলে ঢাকা শহরসহ সারা দেশের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে মিছিল চলতে থাকে। প্লোগানে প্লোগানে প্রকম্পিত হতে থাকে ঢাকার রাজপথ। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে এগারোটায় নবাবপুর রোডে একটি মিছিলে পুলিশ পিছন থেকে গুলি চালায়। পুলিশের ছোঁড়া গুলি শফিকের পিঠ ফুঁড়ে কলিজা ছেদ করে বেরিয়ে যায়। গুলি খেয়ে তিনি সামনে খোশমহল রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে পড়ে যান। লোকজন ধরাধরি করে তাঁকে ঢাকা মেডিকলে নিয়ে যায়। অপারেশনও করা হয়। তাঁকে বাঁচানোর সব ধরনের চেষ্টা করেন চিকিৎসকগণ। কিন্তু সকলকে কাঁদিয়ে তিনি রাতেই শাহাদাত বরণ করেন। আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়।

অহিদুজ্জামান ওরফে অহিউল্লাহ্

৯-১০ বছর বয়সের এ কিশোর ২২ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন। তাঁর লাশ সাথে সাথেই পুলিশ সরিয়ে ফেলে। পরদিন দৈনিক আজাদ পত্রিকাও পাঠ করে মানুষ তার শাহাদাত বরণের কথা অবগত হয়। বাংলা ১৩৬২ সনের ১১ ফাল্গুন 'সাপ্তাহিক নতুন দিন' এ বলা হয় যে, অহিউল্লাহর পিতার নাম হাবিবুর রহমান। পিতা ছিলেন পেশায় রাজমিস্ত্রী। ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিল নবাবপুর রোড হয়ে দক্ষিণ দিকে যাবার সময়ে খোশমহল রেস্টুরেন্টের সামনে পুলিশের ছোঁড়া রাইফেলের গুলি লাগে অহিউল্লাহর মাথায়। সঙ্গে সঙ্গেই শাহাদাত বরণ করে অহিউল্লাহ্।

নাম না জানা ৯-১০ বছরের এক কিশোর: একুশে ফেব্রুয়ারির পুলিশী নির্যাতন, নিপীড়ন ও গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারির মতোই ২৩ ফেব্রুয়ারিও ঢাকা ছিল মিছিল-সমাবেশ-আন্দোলনে উত্তাল। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছিল হরতাল। শুধু ঢাকা শহর নয় এদিন সারাদেশব্যাপী প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, মিছিল-মিটিং চলতে থাকে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুলার রোডে ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশ গুলি চালালে একজন নাম না-জানা কিশোর শাহাদাত বরণ করেন। (অনেকে আবার এ কিশোরটিকে অহিউল্লাহ বলেছেন।)

আব্দুল আউয়াল

ঢাকার মৌলভীবাজারে আব্দুল আউয়াল পেশায় ছিলেন রিকসা চালক। একুশে ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারি যখন ছাত্র জনতার মিছিল পুরনো ঢাকার বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করছিল তখন পুলিশের গুলিবর্ষণে ঢাকার নবাবপুর রোডে শাহাদাত বরণ করেন আব্দুল আউয়াল। শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ২৬ বছর।

ওয়াহিদুল্লাহ

ওয়াহিদুল্লাহ ছিলেন ঢাকার লুৎফর রহমান লেনের বাসিন্দা। তিনি ২২ ফেব্রুয়ারি ছাত্র জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। শাহাদাত বরণের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৪০ বছর।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০৮ শহীদ মিনার

টপিক ০৮: শহীদ মিনার

This Topic is important for



MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি/৮ ফাল্গুন ছিল বৃহস্পতিবার। অপরাহ্ন ৩টার কিছু পর নিরস্ত্র ছাত্র মিছিলে মুসলিম লীগ সরকারের আদেশে গুলি চালালে কয়েকজন নিহত ও অনেকে আহত হন। একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র হত্যার সংবাদ দ্রুত সারাদেশে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা শহরের মানুষ ছুটতে থাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দিকে আহত-নিহতদের দেখতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ নেতারা তখন গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পুলিশ হন্যে হয়ে ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ নেতাদের গ্রেপ্তার করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্র সংসদের ভি. পি. গোলাম মওলা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, মেডিকেল কলেজের যে স্থানে পুলিশ গুলিবর্ষণ করেছিল ঠিক সেখানেই দ্রুত শহীদ মিনার গড়ে তুলতে হবে। তিনি গোপনে আলোচনায় বসলেন সে সময়ের মেডিকেলের 'নেতৃত্বস্থানীয়' ছাত্র বদরুল আলম, ১০ আলীম চৌধুরী, মঞ্জুর আহমেদ, এম. ডি. আহমেদ^{১১} প্রমুখের সাথে।

মেডিকেলের মেধাবী ছাত্র বদরুল আলমের আঁকাআঁকিরও নেশা ছিল। তাঁকেই দায়িত্ব দেয়া হয় প্রস্তাবিত শহীদ মিনারের ডিজাইন আঁকার জন্য। সবাই আলোচনা করে সামান্য রদবদল করে নকশা বা ডিজাইন চূড়ান্ত করেন। এবারে শহীদ মিনার নির্মাণের পালা। ১০ ফুট x ৬ ফুট আয়তনের শহীদ মিনার নির্মাণের জন্য ইট-বালু-সিমেন্ট কোথেকে আসবে তা নিয়ে সলা-পরামর্শ শুরু হলো। তাঁরা মেডিকেল কলেজের ছাত্রাবাস (নার্সেস কোয়ার্টার)-এর দোতলা এবং প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের জন্য স্তূপ করে রেখে দেয়া ইট ব্যবহার করার জন্য ঠিকাদার এম. এ. মুত্তালিব-এর পুত্র এম. এ. জহির এর সাথে গোপনে দেখা করে অনুমতি চাইলেন। তিনি সাথে সাথে রাজি হয়ে গেলেন। শুধু ইট নয়, জহির সাহেব রাজমিস্ত্রী, সিমেন্ট, রডসহ সব ধরনের নির্মাণসামগ্রী দিয়ে সাহায্য করলেন। এমনকি রাজমিস্ত্রী যোগালীর সাথে কাজে নেমেও পড়লেন। ছাত্ররা হাতে হাতে ইট নিয়ে, বালুর বস্তা মাথায় করে রাজমিস্ত্রীকে সাহায্য করলো। ২৩ ফেব্রুয়ারি সারারাত ধরে এভাবে চললো দশ ফুট উঁচু ও ৬ ফুট চওড়া শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ। পরবর্তী সময়ে এ বিষয়ে কয়েকজনের সূতিচারণ থেকেও বুঝতে পারা যায় যে, ঢাকা মেডিকেলের ছাত্ররা সেদিন কী অসাধ্য সাধন করেছিলেন।

শহীদ মিনার নির্মিত হলে এটি লাল সালু কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়। এর গায়ে দুটি হাতে লেখা পোস্টার সাঁটিয়ে দেয়া হয়। একটিতে লেখা ছিল 'শহীদ স্মৃতি অমর হোক' এবং অপরটিতে লেখা ছিল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'। এর সামনে একটি কাপড় বিছিয়ে দেয়া ছিল। শহীদ মিনারে পরের দুদিন মানুষের ঢল নেমেছিল। সামনের বিছিয়ে দেয়া কাপড়ে অনেকে টাকা-পয়সা দিয়েছিলেন। অনেক গৃহবধূ তাঁর গায়ের গহনাও দান করেছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয়েছিল মায়ের ভাষার প্রতি বাঙালির দরদ কতটুকু।

২৪ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত শহীদ মিনারের উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমান শফিকের পিতা জনাব মাহবুবুর রহমান। ২৪ ও ২৫ ফেব্রুয়ারি মানুষের ঢল নামে নবনির্মিত শহীদ মিনারের চারপাশে। ২৫ তারিখ সকালেই পুলিশ এসে কর্ডন করে রেখেছিল শহীদ মিনার। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি মানুষের ঢলকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। অবশেষে সরকারের নির্দেশে অজস্র সশস্ত্র পুলিশ শহীদ মিনারসহ মেডিকেল কলেজ হোস্টেল ঘেরাও করে। এরপর তারা ভাঙতে শুরু করে নবনির্মিত মিনারটি। উপড়ে ফেলে এর ভিত্তি। তখনো এর গাঁথুনি ছিল কাঁচা ও নরম। ছাত্র-জনতা উত্তেজিত ও আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় বারের মতো ২৬ ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনার উদ্বোধন করেন একুশের পুলিশি গুলি বর্ষণের প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের সদ্য পদত্যাগী সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দীন। কিন্তু ২৬ ফেব্রুয়ারি পুলিশ শহীদ মিনারের শেষ চিহ্নটুকুও ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়। কিন্তু পুলিশি তাগুব সত্ত্বেও রক্ষা পেয়েছিল মেডিকেল কলেজের ১২নং ব্লকের বেড়ার গায়ে সাঁটানো পোস্টারটি। এ পোস্টারটিতে ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সেই অমর উক্তি-

"বীরের এ রক্তস্রোত
মাতার এ অশ্রুধারা
এর যতো মূল্য সে কি
ধরার ধুলায় হবে হারা?"

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ০৯ ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও অবদান

টপিক ০৯: ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য ও অবদান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত সময়ের ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং অবদান অনন্য ও অপরিমিত। ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষা বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনই ছিল না। অচিরেই তা রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়। ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও প্রভাব ছিল নিম্নরূপ :

১. বাঙালি জাতীয়তার উন্মেষ: ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। এ আন্দোলনের মধ্য দিয়েই বাঙালিরা সর্বপ্রথম নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, স্বতন্ত্র অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের সাথে শুধু ধর্মের বন্ধন ছাড়া বাঙালিদের যে আর কোনো বন্ধন বা সম্পর্ক নেই-সে সম্পর্কে তারা প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। ১৯৫২ সালের মহান একুশের রক্তদানের ফলে যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকশিত হয়-সেই চেতনার ফসলই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

২. সাংস্কৃতিক আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধিকার আন্দোলনে : ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালিদের স্বাধিকার আন্দোলন। এ আন্দোলন ছিল জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা উন্মেষের আন্দোলন। প্রথমে এ আন্দোলন ছিল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য। এ আন্দোলনে সর্বস্তরের বাঙালি জনগণের অংশগ্রহণের কারণ ছিল তিনটি; যথা- (১) পাঞ্জাবি আমলা ও সেনাচক্রের গণ-বিরোধী শাসন, (২) অর্থনৈতিক শোষণ ও (৩) বাঙালিদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ। ফলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন নিছক ভাষা ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে জনগণের দাবি হয়ে গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল।

৩. বাঙালিদের অধিকার-সচেতনতা: ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। বাঙালি জনগণ তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবিসমূহ উত্থাপন করে তা আদায় করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়।
৪. সংগ্রামী চেতনার সূচনা: ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে যে, সংগ্রামের মাধ্যমেই তাদেরকে দাবি-দাওয়া আদায় করতে হবে এবং ভালোভাবে বেঁচে থাকার পথ খুঁজতে হবে।
৫. স্বাতন্ত্র্যবোধের বিকাশ: ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা বাঙালি জনগণকে এ ধারণা প্রদান করে যে, পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রে বসবাস করলেও তাদের রয়েছে স্বতন্ত্র স্বার্থ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।
৬. ছাত্রসমাজের গুরুত্ব বৃদ্ধি: ভাষা আন্দোলনের পর থেকে ছাত্রসমাজের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তারা একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।
৭. মধ্যবিত্ত শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি : ভাষা আন্দোলনে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। এরপর স্বভাবতই বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনীতির কেন্দ্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়।

৮. সংহতি ও একাত্মতাবোধ: ভাষা আন্দোলন বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয় সংহতি ও একাত্মতাবোধের উন্মেষ ঘটায়। পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনের সময় তাদের এ জাতীয় সংহতি ও একাত্মতাবোধ আরো সুদৃঢ় হয়।

৯. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। এ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বাঙালি জনগণকে ভবিষ্যতে ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

১০. শহীদ মিনার : ভাষা আন্দোলনের বীর শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য গড়ে ওঠে শহীদ মিনার। শহীদ মিনার হয়ে ওঠে বাঙালির তীর্থকেন্দ্র, সকল দুঃখে, বিপদে আপদে শ্রেষ্ঠ সহায় ও নির্ভরতার প্রতীক।

পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে ৬ দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো সুসংগঠিত করে তোলে। শুরু হয় ১৯৬৮-৬৯ এর গণ-আন্দোলন। ২১-এর চেতনা থেকে সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম সাফল্যজনক বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে। সুতরাং ২১-এর চেতনা থেকেই বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। এ জাতীয়তাবাদী চেতনা থেকেই উদ্ভব হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১০ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

টপিক ১০: ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নির্বাচনের পটভূমি: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করে। প্রচলিত সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীন পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল ১৯৫১ সালে। ১৯৪৯ সালের ২৬ এপ্রিল পূর্ব বাংলায় টাঙ্গাইলের উপনির্বাচনে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ-এর প্রার্থী জমিদার পল্লী সাহেব তরুণ প্রার্থী যুব নেতা জনাব শামসুল হক-এর নিকট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। এর ফলে মুসলিম লীগের মধ্যে নির্বাচন ভীতি দেখা দেয়। মুসলিম লীগ সরকার পরাজয়ের আশঙ্কায় ৩৪টি শূন্য আসনে উপনির্বাচন স্থগিত রাখেন। ১৯৫১ সালে পূর্ববাংলা আইনসভার যে নির্বাচন হবার কথা ছিল তা করতেও তারা সাহসী হননি। ১৩ পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫১ সালেই প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন সম্পন্ন হয়। জনগণের চাপে সরকার ১৯৫৩ সালে সিন্ডিকেটে নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন। 'The East Bengal Legislative Assembly (Continuation) Act, 1953' পাস করে মুসলিম লীগ সরকার 'পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের' (আইনসভার) মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করে। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটে। ভাষা আন্দোলনের পর পূর্ব বাংলার জাগ্রত জনতার আন্দোলনের চাপে বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সরকার ১৯৫৪ সালের মার্চ মাসে প্রাপ্ত বয়স্কদের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করেন। অবশেষে ৮ থেকে ১২ মার্চ এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন পদ্ধতি : ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের নির্বাচন বিধি সংশোধন করে পাকিস্তান গণপরিষদ ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে নতুন নির্বাচন বিধি প্রণয়ন করে। এ নির্বাচন বিধি ছিল নিম্নরূপ :

১. ২১ বছর বয়স্ক সকল নাগরিক ভোট দিতে পারবেন।
২. নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ২১ বছর বয়স্ক নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে।
৩. 'পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা' অনুসরণ করা হবে।
৪. অমুসলমান নাগরিকদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে।

নির্বাচনি আসন

এ নির্বাচন পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবার বিধান করা হয়। মোট আসন নির্ধারণ করা হয় ৩০৯টি। এর মধ্যে ২৩৭টি আসন নির্ধারণ করা হয় শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য। বাকি ৭২টি আসন নির্ধারণ করা হয় অমুসলমানদের জন্য। মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। এ ১৫টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের ৯টি মুসলমানদের জন্য, ১টি বর্ণ হিন্দুদের জন্য, ২টি তফশিলি হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য, ১টি খ্রিস্টান ও ১টি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়। ১৯৫১ সালে জনসংখ্যা জরিপের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে এ নির্বাচনি আসন বণ্টন করা হয়। আনুমানিক ১ লাখ ৪০ হাজার অধিবাসীর জন্য একটি নির্বাচনি আসন নির্ধারণ করা হয়। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৫টি আসনের নির্বাচনে শুধুমাত্র পৌরসভা এলাকায় মহিলাদেরই ভোট দানের অধিকার প্রদান করা হয়। ১৯৫৩ সালের ১ জানুয়ারি যাদের বয়স ২১ বছর পূর্ণ হয়েছিল তারাই এ নির্বাচনে ভোটার হবার যোগ্য ছিলেন।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১১ যুক্তফ্রন্ট গঠনের রাজনৈতিক পটভূমি

টপিক ১১: যুক্তফ্রন্ট গঠনের রাজনৈতিক পটভূমি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৪৬ সালে অবিভক্ত বাংলার আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এর পিছনে সর্বাধিক অবদান ছিল হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর। নির্বাচন শেষে সোহ্‌রাওয়ার্দী অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ জিন্নাহ-নাজিমুদ্দিন-লিয়াকত আলী খানের 'পকেট সংগঠনে' পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর জিন্নাহ-লিয়াকত আলী খান সোহ্‌রাওয়ার্দীর পরিবর্তে খাজা নাজিমুদ্দিনকে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ফলে পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগের যুব নেতৃবৃন্দ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে এ বিক্ষুব্ধ মুসলিম লীগ সদস্যদেরকে নিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন 'আওয়ামী মুসলিম লীগের' জন্ম হয়। ১৯৫২ সালের 'ভাষা আন্দোলন' বাঙালি-জনগণকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে। ২১ ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড, ময়মনসিংহে হাজং কৃষকদের নির্মমভাবে হত্যা, খুলনায় পুলিশের গুলিবর্ষণ, দিনাজপুর ও রাজশাহী জেলে রাজবন্দীদের উপর নির্যাতন, নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ দমনে পাশবিক নির্যাতন, লবণ সংকট, পাট শিল্পের কেলেক্কারি এবং বিভিন্ন ধরনের গণবিরোধী কাজের জন্য ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে।

পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের নির্বাচন ঘোষিত হলে তাই ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ও কৃষক প্রজাপার্টির নেতা শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক একটি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করে একটি নির্বাচনি জোটে একতাবদ্ধ হন। ১৫ সদরঘাটের ৫৬, সিমসন রোডে যুক্তফ্রন্টের প্রধান অফিস স্থাপিত হয়।

পরবর্তীতে নেজামে-ই-ইসলাম, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, গণতন্ত্রী দল যুক্তফ্রন্টে শরীক হয়। মহান একুশে ফেব্রুয়ারির স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্যই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি কর্মসূচি '২১টি দফায়' বিন্যস্ত করা হয়। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি প্রতীক ছিল 'নৌকা'। যুক্তফ্রন্টের সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। পার্লামেন্টারি বোর্ডের সদস্য হন এ.কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা ভাসানী, আতাউর রহমান খান, আবুল মনসুর আহম্মদ, শেখ মুজিবুর রহমান, আবু হোসেন সরকার, কফিল উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ নেতা সমগ্র পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনি জনসভায় বক্তব্য রেখে জনমত সৃষ্টি করেন। তাঁদের বক্তব্য জনগণের নিকট সমাদৃত হয়।



শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক



হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী



মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১২ যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি

টপিক ১২: যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৫৪ সালে 'যুক্তফ্রন্ট' নেতাগণ ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষা শহীদের স্মৃতি অম্লান করে রাখার জন্য শ্রদ্ধাভরে তাদের কর্মসূচিকে ২১টি দফায় লিপিবদ্ধ করেন। যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ:

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে।
২. বিনা খেসারতে জমিদারি প্রথা ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্বত্ব উচ্ছেদ করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বণ্টনের ব্যবস্থা করা হবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস এবং সার্টিফিকেট জারি করে খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হবে।
৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও পাটের ন্যায্যমূল্য প্রদান করা হবে। মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার পাট কেলেক্কারি তদন্ত ও অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করা হবে।
৪. সমবায় কৃষি পদ্ধতির প্রবর্তন এবং সরকারি সাহায্যে কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করা হবে।
৫. পূর্ব বাংলাকে লবণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হবে। মুসলিম লীগ শাসনামলের লবণ কেলেক্কারি তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদান করা হবে।
৬. অবিলম্বে বাস্তুহারাদের পুনর্বাসন করা হবে।
৭. সেচ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, বন্যানিয়ন্ত্রণ ও দুর্ভিক্ষ রোধ করা হবে।

৮. পূর্ব-বাংলাকে শিল্পায়িত করা এবং শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা হবে।
৯. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন ও শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে।
১০. সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবধান দূর করা হবে এবং বাংলা ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা হবে।
১১. বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত সকল কালাকানুন বাতিল করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
১২. প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচ ও কর্মচারীদের বেতনের সামঞ্জস্য বিধান করা হবে এবং মন্ত্রীদের এক হাজার টাকার বেশি বেতন দেওয়া হবে না।
১৩. ঘুষ, দুর্নীতি বন্ধ ও সম্পত্তির হিসাব গ্রহণ করা এবং ১৯৪০ সাল থেকে অর্জিত অবৈধ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে।
১৪. সকল নিরাপত্তাবন্দীকে মুক্তিদান, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও বাকস্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করা হবে।

১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা হবে।

১৬. 'বর্ধমান হাউস'কে (বর্তমান বাংলা একাডেমী) আপাতত ছাত্রাবাস এবং পরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গবেষণাগার করা হবে।

১৭. বাংলা ভাষার জন্য শহীদদের স্মরণে 'শহীদ মিনার' নির্মাণ করা হবে।

১৮. একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন করা হবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাব অনুযায়ী পূর্ব-বাংলাকে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান, পূর্ব বাংলায় নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর স্থাপন, অস্ত্র কারখানা নির্মাণ এবং আনসার বাহিনীকে 'মিলিশিয়া' হিসেবে গড়ে তোলার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দ্বারা আইনসভার আয়ু বর্ধিত করা হবে না। সাধারণ নির্বাচনের ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবে এবং নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হবে।

২১. আইনসভার শূন্য আসন তিন মাসের মধ্যে পূরণ করা হবে এবং পরপর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা পরাজিত হলে মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবেন।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১৩ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

টপিক ১৩: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল

This Topic is important for



MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

নির্বাচনের ফলাফল: ১৯৫৪ সালের ১০ মার্চ অনুষ্ঠিত নির্বাচনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৩০৯টি। এর মধ্যে মুসলিম আসন ছিল ২৩৭টি এবং অমুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ৭২টি।

২৩৭টি আসনের মধ্যে ১৪৩টি আসন লাভ করে আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের সর্বাপেক্ষা বড় দলে পরিণত হয়। অমুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ৭২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তপশীলী ফেডারেশন ২৭টি, যুক্তফ্রন্ট ১৩টি, খ্রিস্টান সম্প্রদায় ১টি, বৌদ্ধ সম্প্রদায় ২টি, কম্যুনিষ্ট পার্টি ৪টি, নির্দলীয় সদস্যগণ ১টি আসন লাভ করে।

নির্বাচনি ফলাফলের ছক

আসনের প্রকৃতি ও সংখ্যা	রাজনৈতিক দল বা জোটের নাম			প্রাপ্ত আসন
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ২৩৭টি	যুক্তফ্রন্ট	...	...	২২৩
	মুসলিম লীগ	...	...	৯*
	নির্দল/স্বতন্ত্র	...	...	৪
	খেলাফতে রব্বানী	...	...	১
অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২টি	যুক্তফ্রন্ট	...	...	১৩
	তপশীলী ফেডারেশন	...	...	২৭
	কংগ্রেস	...	...	২৪
	খ্রিস্টান	...	...	১
	বৌদ্ধ	...	...	২
	কম্যুনিষ্ট পার্টি	...	...	৪
	নির্দল/স্বতন্ত্র	...	...	১
সর্বমোট আসন (২৩৭ + ৭২) = ৩০৯				

এ নির্বাচনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিক হলো ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মাত্র ৯টি আসন লাভ। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনসহ মন্ত্রিসভার ৫ জন প্রভাবশালী সদস্য এই নির্বাচনে পরাজয় বরণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন আইনশাস্ত্রে স্নাতক ডিগ্রিধারী একজন তরুণ ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের নিকট পরাজিত হন বিপুল ভোটের ব্যবধানে। শিল্পমন্ত্রী সৈয়দ আব্দুস সেলিমের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়। মোনায়েম খান, তোফাজ্জল আলী, খান আব্দুস সবুর খান, সৈয়দ মোহাম্মদ আফজাল প্রমুখ শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম লীগ নেতা নির্বাচনে পরাজিত হন বিপুল ভোটের ব্যবধানে। 'ইসলামের দোহাই' এবং 'পৃথক নির্বাচনের ওয়াদাও' মুসলিম লীগকে নির্বাচনে পরাজয় থেকে বাঁচাতে বা রক্ষা করতে পারেনি।

যুক্তফ্রন্টের প্রাপ্ত ২২৩টি আসনের মধ্যে দলওয়ারী প্রাপ্ত আসন ছিল নিম্নরূপ :

দলের নাম	আসন সংখ্যা
আওয়ামী লীগ	১৪৩
কৃষক শ্রমিক পার্টি	৪৮
নেজামে ইসলাম	১৯
গণতন্ত্রী পার্টি	১৩

মুসলমান আসনের জেলাভিত্তিক ফলাফল :১৮

ক্রমিক নং	জেলা	মোট আসন	বুজফুট	মুসলিম লীগ	খেলাফতে রসুলানী পার্টি	বতন্ত্র
১.	দিনাজপুর	৬	৬	-	-	-
২.	রংপুর	১৬	১১	৪	-	১
৩.	বগুড়া	৮	৮	-	-	-
৪.	রাজশাহী	১৩	১২	-	-	১
৫.	পাবনা	৯	৯	-	-	-
৬.	কুষ্টিয়া	৬	৬	-	-	-
৭.	যশোর	৮	৭	১	-	-
৮.	খুলনা	৮	৮	-	-	-
৯.	বাখরগঞ্জ	২০	১৯	-	-	১
১০.	ফরিদপুর	১৪	১৪	-	-	-
১১.	ঢাকা	২৩	২৩	-	-	-
১২.	মোমেনশাহী	৩৪	৩৪	-	-	-
১৩.	সিলেট	১৫	১১	২	১	১
১৪.	ত্রিপুরা	২২	১৫	২	-	৫
১৫.	নোয়াখালী	১৩	১২	-	-	২
১৬.	চট্টগ্রাম	১৩	১১	-	-	১
	মহিলা	৯	৯	-	-	
	মোট =	২৩৭	২১৫	৯	১	১২

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১৪ ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

টপিক ১৪: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম। এ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল নিম্নরূপ :

১. মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রভাব বৃদ্ধি: এ নির্বাচনে বিজয়ী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের প্রায় সকলেই ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে আগত। এ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণি রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজনীতিতে তাদের প্রভাবও বৃদ্ধি পায়।

২. বাঙালি জাতীয়তাবাদ: এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয়। এ নির্বাচনের ফলে ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো সুদৃঢ় হয় এবং রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। এ জাতীয়তাবাদী চেতনাই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বে আরো বিকশিত ও সুদৃঢ় হয়। এ জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনারই ফসল হচ্ছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

৩. অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের ফলে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারাই জয়যুক্ত হয়। এর ফলে পরবর্তী সময়ের রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা আরো বিস্তৃত হয়।

৪. নির্বাচনি প্রতীক হিসেবে 'নৌকার' পরিচিতি: ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের প্রতীক ছিল 'নৌকা'। নদীমাতৃক পূর্ববাংলার সাধারণ মানুষ 'নৌকা' প্রতীককে তাদের অত্যন্ত পরিচিত প্রতীক হিসেবে সাদরে গ্রহণ করে। এ প্রতীক নিয়েই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নজীরবিহীন সাফল্য অর্জন করেন।

৫. মুসলিম লীগের ভরাডুবি: ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনা, লবণ সংকট, পাট শিল্পজনিত কেলেক্কারি, স্বায়ত্তশাসন বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রভৃতির ফলে পূর্ব বাংলার বাঙালি জনগণ মুসলিম লীগ শাসনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং মুসলিম লীগের পরাজয় ও ভরাডুবি ঘটে।

৬. স্বায়ত্তশাসনের দাবি: ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে প্রমাণিত হয় যে, বাঙালি জনগণের প্রধান দাবি ছিল স্বায়ত্তশাসনের দাবি। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের ফলে এ দাবিই জয়যুক্ত হয়। স্বায়ত্তশাসনের দাবি পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফায় স্পষ্ট ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বাঙালি জনগণের নিকট অতি দ্রুত তা সমাদৃত হয়।

৭. রাজনৈতিক সচেতনতা: এ নির্বাচনে বিজয়ের ফলে বাঙালি জনগণের সংহতি ও সচেতনতাবোধ আরো সুদৃঢ় হয়। এ সচেতনতা বোধেরই ফসল আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায় যে, বাঙালি জনগণের রাজনৈতিক অগ্রগতিতে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ছিল অপরিসীম। এ নির্বাচনের ফলে ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট বাঙালি জাতীয়তাবাদ আরো সুদৃঢ় হয় এবং রাজনৈতিক স্বীকৃতি অর্জন করে। এ জাতীয়তাবাদী চেতনারই ফসল হচ্ছে আজকের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১৫ মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ

টপিক ১৫: মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিশেষ কতগুলো কারণে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয় ঘটে। এ কারণগুলো নিম্নরূপ

১. মুসলিম লীগের অভ্যন্তরে আদর্শগত কোন্দল ও অন্তর্দ্বন্দ্ব: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর বিভিন্ন প্রদেশে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল দেখা দেয়। উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা পীর মাক্কী শরীফ সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক প্রমুখের নেতৃত্বে মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশ ১৯৪৯ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি স্বতন্ত্র সংগঠন সৃষ্টি করেন। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী 'নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর নেতৃত্ব গ্রহণ করলে সংগঠনটি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। সমগ্র পাকিস্তানে প্রগতিশীল নেতা কর্মীগণ মুসলিম লীগের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন হয়ে ওঠেন এবং নতুন বিরোধী দল গঠন করায় মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. ২১ ফেব্রুয়ারির বিয়োগান্তক ঘটনা: ১৯৪৭ সালের পর শুরু হয় বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্ত শুরু করেন। এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" শ্লোগানে মুখরিত ছাত্র-ছাত্রীদের শান্তিপূর্ণ মিছিলে মুসলিম লীগ দলীয় মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীনের নির্দেশে পুলিশ গুলি চালালে বরকত, সালাম, জব্বার, রফিক প্রমুখ অনেক সম্ভাবনাময় তরুণ শহীদ হন। এ নৃশংস ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশের আপামর জনসাধারণ মুসলিম লীগের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে। ফলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ পরাজিত হয়।

৩. মুসলিম লীগের অগণতান্ত্রিক মনোভাব: ১৯৪৯ সালে টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত একটি উপনির্বাচনে পরাজয়ের ফলে মুসলিম লীগের নেতাদের মধ্যে নির্বাচন ভীতির সৃষ্টি হয়। এ নির্বাচন ভীতির ফলে ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন মুসলিম লীগ স্থগিত রাখে এবং প্রাদেশিক আইনসভার মেয়াদ আরো তিন বছর বাড়িয়ে দেয়। মুসলিম লীগের এ অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তের ফলে পূর্ব বাংলার মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৪. স্বায়ত্তশাসনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন: পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে। লাহোর প্রস্তাবের মূল বক্তব্যই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন। কিন্তু ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ স্বায়ত্তশাসন প্রদানের পরিবর্তে পূর্ববাংলার জনগণের উপর শোষণ ও জাতিগত নিপীড়ন শুরু করে। যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অর্জনের এ আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করে জনগণের মনে আবেদন সৃষ্টি করেন।

৫. মুসলিম লীগ সরকারের পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন: পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগের তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের পরিচালনা ক্ষমতা ভারত থেকে আগত উর্দুভাষী নেতৃবৃন্দ ও পাঞ্জাবি আমলা-সেনাবাহিনীর হাতে চলে যায়। এ কায়েমী স্বার্থবাদী মহল শুরু থেকেই বাঙালিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে সুকৌশলে ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের ইচ্ছা ছিল পূর্ব বাংলাকে পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত করা। মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের এ ষড়যন্ত্রের ফলে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। মুসলিম লীগ সরকারের শাসনামলে সৃষ্ট এ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও বিমাতাসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আন্দোলন পরিচালনা করে আসছিলেন। এর ফলে জনগণ এ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে ও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় প্রদান করে।

৬. মুসলিম লীগের প্রশাসনিক ব্যর্থতা: মুসলিম লীগ শাসনামলে খাদ্য সংকট, লবণ সংকট ও বন্যা সমস্যা দেখা দেয়। মুসলিম লীগ সরকার এসব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়। এমনকি মুসলিম লীগ সরকারের পাট কেলেকারি ফাঁস হয়ে যায়। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি বিমুগ্ধ হয়ে ওঠে। অপরদিকে যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ তাদের ২১ দফা কর্মসূচিতে লবণ সংকট, খাদ্য সংকট ও বন্যা সমস্যার সমাধানের নিশ্চয়তা প্রদান ও মুসলিম লীগ শাসনামলের দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান পরিচালনার ঘোষণা প্রদান করে। এ ঘোষণা পূর্ব বাংলার জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

৭. মুসলিম লীগ কর্তৃক নির্যাতনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ: ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকার প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকামী ছাত্র-যুব-রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে 'দেশদ্রোহী', 'ভারতের অনুচর', 'কম্যুনিষ্ট' আখ্যায় আখ্যায়িত করে তাদের উপর নির্যাতন চালায়। এ নির্যাতিত নেতারা 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করেন। এর ফলে পূর্ব বাংলার জনগণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিপক্ষে ও যুক্তফ্রন্টের পক্ষে রায় প্রদান করেন।
৮. মধ্যবিত্ত বাঙালি শ্রেণির বিকাশ: পাকিস্তান সৃষ্টির পর হিন্দু জমিদার, ব্যবসায়ী, সরকারি কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীগণ ব্যাপক হারে ভারতে চলে যাওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যে সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য উঠতি মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির সৃষ্টি হয়। এ বিকাশমান বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি মুসলিম লীগের পরিবর্তে যুক্তফ্রন্টের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নের পথ বেছে নেয়।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১৬ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, ১৯৫৪

টপিক ১৬: যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা, ১৯৫৪

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর 'যুক্তফ্রন্ট' শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে সর্বসম্মতিক্রমে 'সংসদীয় নেতা' নির্বাচন করে। তদানীন্তন পূর্ব বাংলার গভর্নর চৌধুরী খালিকুজ্জামান ২৫ মার্চ শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক প্রথমে চার সদস্যবিশিষ্ট পূর্ববাংলা প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এঁরা হলেন তিনি নিজে মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্য তিনজন সদস্য হলেন আবু হোসেন সরকার, আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী এবং সৈয়দ আজিজুল হক নান্না মিঞা। এঁদের মধ্যে আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী ছিলেন নেজামী ইসলামির এবং বাকি দুজন তাঁর নিজ দল কৃষক শ্রমিক পার্টির (KSP)। মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে আওয়ামী লীগ ও যুক্তফ্রন্টের অন্যান্য শরীক দলের সাথে শেরে বাংলার মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। ২০ অবশেষে যুক্তফ্রন্টের মূল দল আওয়ামী লীগের ৭ জন এবং কৃষক শ্রমিক - পার্টির আরো ৩ জন সদস্য নিয়ে ১৫ মে তিনি বর্ধিত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ হলেন:

যুগ্মফ্রন্ট মন্ত্রিসভা

নাম	পদবি
১. শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক	মুখ্যমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র, সংস্থাপন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, স্বায়ত্তশাসন, নির্বাচন ও পার্লামেন্টারি বিষয়সহ।)
২. আবু হোসেন সরকার	অর্থমন্ত্রী
৩. আতাউর রহমান খান	খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ মন্ত্রী
৪. আবুল মনসুর আহমদ	জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী
৫. কফিল উদ্দিন চৌধুরী	বিচার ও আইন মন্ত্রী
৬. সৈয়দ আজিজুল হক	শিক্ষা ও রেজিস্ট্রেশন মন্ত্রী
৭. আব্দুস সালাম খান	শিল্প ও শ্রম মন্ত্রী
৮. শেখ মুজিবুর রহমান	কৃষিক্ষেত্র, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রী
৯. আঃ লতিফ বিশ্বাস	রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী
১০. মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন	স্টেট অ্যাকুইজিশন (জমিদারি অধিগ্রহণ) মন্ত্রী
১১. রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী	স্বাস্থ্য ও কারা (জেল) মন্ত্রী
১২. ইউসুফ আলী চৌধুরী	কৃষি, বন ও পাটমন্ত্রী
১৩. আশরাফ আলী চৌধুরী	সড়ক ও গৃহনির্মাণ মন্ত্রী
১৪. হাশিম উদ্দিন আহমদ	বাণিজ্য ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন মন্ত্রী

শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' ও সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং বর্ধমান হাউসকে 'বাংলা একাডেমী' করার প্রস্তাব গ্রহণ ও অনুমোদন করে। শুরু থেকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়কে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার গৃহীত কার্যক্রম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারকে শঙ্কিত করে তোলে। কেননা বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে তারা কোনোদিন সুনজরে দেখেনি। এজন্য তারা প্রথম থেকেই এ সরকারকে বাতিল করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে সক্রিয় ছিল।

১৯৫৪ সালের ১৫ মে কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারের গোপন ইঙ্গিতে নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে ও চন্দ্রঘোনার কর্ণফুলী কাগজ কলে বাঙালি-অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেওয়া হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বাঙালি-অবাঙালি ওয়ার্ডেনদের মধ্যে দাঙ্গা সৃষ্টি করা হয়। এজন্য অন্যায়ভাবে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে দায়ী করা হয়। সবশেষে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের বিরুদ্ধে 'ভারতের চর ও দেশদ্রোহিতার' অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। এভাবে একের পর এক ষড়যন্ত্রের পর ১৯৫৪ সালের ২৯ মে পূর্ববঙ্গে '৯২ক' ধারা জারি করে গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠা করে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের কুচক্রী গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পন্থায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হকের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১৭ পূর্ব বাংলায় আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ
মন্ত্রীসভা এবং এর সাফল্য

টপিক ১৭: আতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা এবং এর সাফল্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৫৬ সালের ১৩ আগস্ট আওয়ামী লীগ আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে। ইতিমধ্যে গণতন্ত্রী দল, কংগ্রেস, তফসিলি ফেডারেশন ও ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করলে আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিসভার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। আবু হোসেন সরকার পদত্যাগ করেন এবং গভর্নর এ. কে. ফজলুল হক-এর আমন্ত্রণে ১৯৫৬ সালের ৬ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হন। আওয়ামী লীগের ৫ জন, কংগ্রেসের ২ জন, গণতন্ত্রী দলের ১ জন, ইউ. পি.পি. দলের ১ জন, তফসিলি ফেডারেশনের ১ জন এবং কৃষক প্রজা পার্টির ১ জন দলছুট সদস্যকে নিয়ে এ মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মন্ত্রিসভায় সদস্যগণ ছিলেন-

নাম	পদবি
১. আতাউর রহমান খান	মুখ্যমন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বসহ)
২. আবুল মনসুর আহমেদ	শিক্ষামন্ত্রী
৩. কফিল উদ্দিন চৌধুরী	যোগাযোগ, পূর্ত ও স্টেট মন্ত্রী
৪. শেখ মুজিবুর রহমান	শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম ও দুর্নীতি দমন মন্ত্রী
৫. মাহমুদ আলী	রাজস্ব ও কারা মন্ত্রী
৬. মশিউর রহমান	জনসংযোগ ও স্থানীয় সরকার মন্ত্রী
৭. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত	স্বাস্থ্যমন্ত্রী
৮. মনোরঞ্জন ধর	অর্থ ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী
৯. খয়রাত হোসেন	কৃষি ও পশুপালন মন্ত্রী
১০. আব্দুর রহমান খান	সমবায়, ঋণ, কৃষি ও বাজার মন্ত্রী
১১. ক্যাপ্টেন মনসুর আলী	বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী
১২. শরৎচন্দ্র মজুমদার	আবগারি, মৎস্য ও লবণ বিষয়ক মন্ত্রী
১৩. গৌরচন্দ্র বালু	বন বিষয়ক মন্ত্রী

মন্ত্রিসভার সাফল্য

আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা তাঁদের শাসনামলে এমন কিছু কাজ করেছিলেন যার জন্য বাঙালি জনগণ তাঁদেরকে স্মরণ রাখবে। খুব সংক্ষেপে এ মন্ত্রিসভার সাফল্য বর্ণনা করা হলো। এগুলো নিম্নরূপ:

আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভা দক্ষতার সাথে শক্ত হাতে পূর্ববঙ্গের খাদ্য সংকট মোকাবেলা করেন। এ সময় হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকায় বিদেশ থেকে চাল আমদানির ক্ষেত্রে জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান খাদ্য সংকট মোকাবেলা করার জন্য মন্ত্রী হয়েও দলের নেতা-কর্মীদের নিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং চেষ্টা বেড়িয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের সর্বত্র। দুর্ভিক্ষ মোকাবেলায় আওয়ামী লীগ সরকার দলের নেতা-কর্মীদেরকে নিয়োজিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকার দ্রুত খাদ্য আমদানির পাশাপাশি আরো কিছু ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেন। এগুলো হলো-সারাদেশে 'ফুড কমিটি' গঠন, মজা কবলিত এলাকায় লঙ্গরখানা খোলা, খাদ্য মজুতদার ও কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং খাদ্য ব্যবস্থাপনায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান, ডেপুটি কমিশনার ও খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের সভায় সার্বিক পরিস্থিতি বিশেষ করে খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা ইত্যাদি।

আওয়ামী লীগ সরকার তাঁদের স্বল্পকালীন সময়ের শাসনকালে পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৫-৬০) প্রণয়ন, প্রথম প্লানিং বোর্ড গঠন, প্রথম শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন, ঢাকাস্থ আলিয়া মাদ্রাসার জন্য স্থায়ী ভবন নির্মাণ, ময়মনসিংহে পশু চিকিৎসা কলেজ প্রতিষ্ঠা, সাভার ডেইরি ফার্ম স্থাপন, বনবিভাগে দুটি সার্কেল গঠন, জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন (JMC) গঠন, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাস কারখানা স্থাপন, স্থায়ী শিল্প ট্রাইব্যুনাল গঠন, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন প্রথা চালু এবং ট্রেড ইউনিয়নকে বাধ্যতামূলকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন, সর্বপ্রথম কক্সবাজারে পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন, কৃষিক্ষেত্রের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল, ঢাকা-আরিচা, ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং নগরবাড়ি-রাজবাড়ি যোগাযোগ সড়ক নির্মাণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ব্যবস্থার জন্য 'ওয়াটার অ্যান্ড পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (WAPDA) গঠন, জল সেচের জন্য কৃষকদের নিকট ১০০০ পাওয়ার পাম্প সরবরাহ, সর্বপ্রথম পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য ঢাকার তেজগাঁয়ে চলচ্চিত্র স্টুডিও (FDC) গঠন, বনশিল্প উন্নয়নের জন্য FIDC গঠন, ঢাকার রমনায় 'রমনা গ্রীন পার্ক', বোটানিক্যাল গার্ডেন নির্মাণ, ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং সরকারিভাবে পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন, বাংলা একাডেমিক বিজ্ঞান বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ ও বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনের জন্য অর্থ বরাদ্দ, বাংলা টাইপরাইটার উদ্ভাবনের জন্য অর্থ বরাদ্দ ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এছাড়াও এ সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৫৭ সালের ১ ও ২ এপ্রিল পূর্ব বাংলা আইন পরিষদে 'স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাব' পাস করে। এর ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রাব্যবস্থা রেখে বাদবাকি বিষয়গুলো পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। এর ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের আর একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো 'পৃথক নির্বাচন' ব্যবস্থা বাতিল করে 'যুক্ত নির্বাচন' ব্যবস্থা চালু করা। মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামি, জামায়াতে ইসলামিসহ ধর্মাশ্রয়ী দলগুলো চেয়েছিল 'পৃথক নির্বাচন' পদ্ধতি চালু রাখতে। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ১০-১১ অক্টোবর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'গণপরিষদে' পূর্ব বাংলার জন্য এ ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়। এর ফলে পূর্ব বাংলায় আবার যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা চালু হয়।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১৮ ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান

টপিক ১৮: ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেতৃত্বে দ্বিতীয় গণপরিষদ সংবিধান রচনার কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করে। ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারি দ্বিতীয় গণপরিষদে 'পাকিস্তান ইসলামি প্রজাতন্ত্র সংবিধান বিল' উত্থাপন করা হয়। বিলটি ২১ জানুয়ারি গণপরিষদে চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয় এবং ২ মার্চ গভর্নর জেনারেল এ বিলে সম্মতি প্রদান করে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এ সংবিধান ১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়।

১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের বৈশিষ্ট্য: পাকিস্তান সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. ইসলামি প্রজাতন্ত্র: ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পাকিস্তানকে একটি 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা হয়। পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্ পরিপন্থী কোনো আইন প্রণীত হবে না বলে উল্লেখ করা হয়। সংবিধানে উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান।
২. লিখিত সংবিধান : ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধান ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত সংবিধান। ১০৫ পৃষ্ঠায় এ সংবিধানে একটি প্রস্তাবনা, ১৩টি অংশ, ৬টি তালিকা ও ২৩৪টি ধারা সন্নিবেশিত ছিল।
৩. দুম্পরিবর্তনীয় সংবিধান: এ সংবিধান ছিল দুম্পরিবর্তনীয়। জাতীয় পরিষদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সংশোধনী বিল উত্থাপন করা গেলেও তা পাস করতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হতো।
৪. প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র: ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী সর্বজনীন ভোটাধিকার নীতির ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ভোটে সরকার গঠিত হতো।

৫. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার: এ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংবিধান কর্তৃক ক্ষমতা বণ্টননীতি, যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মতো যুক্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্য এতে বিদ্যমান ছিল।

৬. সংসদীয় সরকার: এ সংবিধান কেন্দ্র ও প্রদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার প্রবর্তন করে। আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন এবং তাদের কাজের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকত।

৭. মৌলিক অধিকার: সংবিধানে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সন্নিবেশিত হয়। মৌলিক অধিকারগুলোকে আদালতের আওতাভুক্ত করা হয়, তবে জরুরি অবস্থা চলাকালে রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার রহিত করতে পারতেন।

৮. রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক নীতি: আয়ারল্যান্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের ন্যায় এ সংবিধানে কতগুলো 'রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্দেশক নীতি' বা আদর্শ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

৯. এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা: এ সংবিধানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়।
১০. যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত: কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে সম্ভাব্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত গঠন করা হয়। সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান এবং সংসদীয় যেকোনো আইনকে সংবিধানসম্মত নয় বলে ঘোষণা করার ক্ষমতা এ আদালতকে প্রদান করা হয়।
১১. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা: এ সংবিধানে আইন ও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও হস্তক্ষেপ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক রাখা হয় এবং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়।
১২. সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা: এ সংবিধানে সংখ্যালঘুদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

THANK YOU

HSC

একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ১৯ ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের
কার্যকারিতা ও এর ব্যর্থতার কারণ

টপিক ১৯: ১৯৫৬ সালের পাকিস্তান সংবিধানের কার্যকারিতা ও এর ব্যর্থতার কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৫৬ সালের ২৩ মার্চ যে সংবিধান প্রণীত ও কার্যকর করা হয়েছিল তা মাত্র দু বছর আট মাসকাল চালু ছিল। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অব.) ইফ্ফান্দার মীর্জা সামরিক আইন জারি করেন এবং ১৯৫৬ সালের সংবিধান বাতিল ঘোষণা করেন। নিম্নলিখিত বহু কারণে পাকিস্তান সংবিধান ব্যর্থ হয়:

১. সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের অনুপস্থিতি: সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও তা সফল করে তোলার জন্য সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল বিকশিত না হওয়ায় এ সংবিধান কার্যকর হতে পারেনি। ১৯৪৭ সালের পর থেকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পরিণত হয়েছিল মুষ্টিমেয় কিছুসংখ্যক ক্ষমতালোভী প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের পকেট সংগঠনে।
২. দলীয় শৃঙ্খলার অভাব: সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন সুকঠিন দলীয় শৃঙ্খলা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে, গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের ষড়যন্ত্র ও দলীয় নেতাদের নৈতিকতার অভাবে রাতারাতি দল বদলের খেলা চলছিল। দলীয় শৃঙ্খলার অভাবের ফলে সরকারের স্থায়িত্ব বিনষ্ট হচ্ছিল।

৩. দলীয় স্বার্থের প্রাধান্য: পাকিস্তানের প্রায় প্রত্যেকটি দলই বিশেষ করে মুসলিম লীগ এ সময় দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থ অপেক্ষা ক্ষুদ্র দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থকে বড় করে দেখতে সচেষ্ট ছিলেন।
৪. উপনির্বাচন স্থগিত ঘোষণা: ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ক্ষমতা হারানোর ভয়ে আইন পরিষদের শূন্য আসনগুলোতে উপনির্বাচন অনুষ্ঠানে গড়িমসি করতে থাকে।
৫. অহেতুক হস্তক্ষেপ: প্রথম থেকেই পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা এবং আইন পরিষদের কাজে রাষ্ট্রপ্রধান অহেতুক হস্তক্ষেপ করায় সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি ও ঐতিহ্য বিনষ্ট হয়। স্বয়ং মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহ্ নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করতেন। গভর্নর জেনারেল গোলাম মুহাম্মদের সময় এ হস্তক্ষেপ বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। গোলাম মুহাম্মদের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ প্রতিরোধের জন্য সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্যত হলে তিনি সংসদীয় রীতি-নীতি উপেক্ষা করে প্রথম গণপরিষদ ভেঙে দেন।

৬. জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতার অভাব: সময়মত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়ায় এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে না ওঠায় জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পায়নি।
৭. কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপ্সা: কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা লিপ্সার কারণে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রহসনে পরিণত হয়। ফলে এ সংবিধানে প্রবর্তিত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সফল হতে পারেনি।
৮. সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে অনীহা: ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ দলের ক্ষমতার মোহ, দলটির দ্রুত ভাবমূর্তি বিনষ্ট হওয়া এবং নির্বাচন হলে ক্ষমতা হারাবার ভয়ের কারণে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর নির্বাচন বিশেষ করে ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গ আইনসভার নির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়ের ফলে তারা আর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেনি।

৯. সহনশীলতার অভাব: সহনশীলতা সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের অন্যতম প্রধান শর্ত। কিন্তু এ সংবিধান কার্যকর থাকাকালীন সময়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সহনশীলতার অভাব মারাত্মক আকার ধারণ করেছিল। পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর ওপর শারীরিক নির্যাতন সহনশীলতার অভাবেরই বাস্তব ফলশ্রুতি।

১০. সংবিধান কমিশনের মত: সংবিধান কমিশন ১৯৬০ সালে তাঁদের রিপোর্টে বলেছিলেন যে, (১) সুষ্ঠু নির্বাচনের অভাব, (২) সংবিধানের অন্তর্নিহিত ত্রুটি-বিচ্যুতি, (৩) রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক মন্ত্রিসভার কার্যক্রমে অহেতুক হস্তক্ষেপ, (৪) রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক দুর্বলতা, অযোগ্যতা ও দুর্নীতি প্রভৃতি ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ব্যর্থতার কারণ।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২০ ইন্সান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক শাসন জারি

টপিক ২০: ইচ্ছান্দার মীর্জা কর্তৃক সামরিক শাসন জারি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৫৮ সালে প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয়লাভের কোনো সম্ভাবনা ছিল না। নির্বাচনে জয়লাভের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল আওয়ামী লীগের। কেননা সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ তখন পাকিস্তানের উভয় প্রদেশেই জনপ্রিয় সংগঠন হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি আমলা-সেনাবাহিনী ও প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাই এ নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত শুরু করে। ১৯৫৮ সালের ২৯ আগস্ট আওয়ামী লীগ নেতা আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করলে পাকিস্তানি শাসকদের ষড়যন্ত্র আরো বৃদ্ধি পায়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের স্পীকার ছিলেন কৃষক-শ্রমিক-প্রজা পার্টির (KSP) আব্দুল হাকিম। তাঁর প্রতি আওয়ামী লীগ দলীয় আইনসভার সদস্যদের আস্থা ছিল না। এজন্য তাঁরা আওয়ামী লীগ দলীয় ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী পাটোয়ারীকে স্পীকার নির্বাচিত করেন।

এ নিয়ে প্রাদেশিক আইনসভায় বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। এক পর্যায়ে ১৯৫৮ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কৃষক-শ্রমিক-প্রজাপার্টি দলের আইনসভার সদস্যগণ হৈ চৈ এবং আসবাবপত্র ভাঙতে শুরু করেন। তাঁদের নিষ্ক্ষিপ্ত আসবাবপত্রের ভাঙা কাঠের আঘাতে শাহেদ আলী পাটোয়ারী গুরুতররূপে আহত হন। ২৬ সেপ্টেম্বর শাহেদ আলী পাটোয়ারী হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। পাকিস্তানের গণতন্ত্রবিরোধী অশুভ শক্তি এ নাজুক পরিস্থিতিতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেন। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে দীর্ঘদিনের ষড়যন্ত্রের নীলনকশা বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

এরূপ অবস্থার প্রেক্ষাপটে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর রাত ১০.৩০ মিনিটে পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মেজর জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনের সংসদীয় সরকারকে উৎখাত করে সমগ্র দেশে সামরিক আইন (Martial Law) জারি করেন। ২৪ ক্ষমতা গ্রহণের ক্ষণে ইস্কান্দার মীর্জা দেশে বিরাজমান দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহারকে পাকিস্তানের অপশাসনের অন্যতম প্রধান কারণ বলে উল্লেখ করেন। সামরিক শাসন জারির ফরমানে ১৯৫৬ সালের সংবিধান, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা বাতিল এবং রাজনৈতিক দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও এ ফরমানবলে রাষ্ট্রপতি জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মীর্জা পরদিন ৮ অক্টোবর পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খানকে 'প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক' (CMLA) নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি ইস্কান্দার মীর্জা ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তান রাষ্ট্র এবং ইসলামকে রক্ষা, দুর্নীতি দূর করা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই তিনি সামরিক শাসন জারি করতে বাধ্য হয়েছেন।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির কারণ

পাকিস্তানে ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির জন্য নিম্নলিখিত কারণকে দায়ী করা হয়:

১. সুসংগঠিত দলের অভাব: ১৯৪৭ সাল থেকেই পাকিস্তানে কোনো সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল গড়ে ওঠেনি। মুসলিম লীগ পরিণত হয়েছিল কয়েকজন কুচক্রী ও ষড়যন্ত্রকারী নেতার পকেট সংগঠনে। আওয়ামী লীগকে দমনপীড়ন করে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা গড়ে না ওঠায় আমলা-সেনাবাহিনী রাজনীতিতে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়াতে সক্ষম হয়। ১৯৫৮ সালে সেনাবাহিনী রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে তাই সাংগঠনিকভাবে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি।
২. দলীয় শৃঙ্খলার অভাব: পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে দলীয় শৃঙ্খলার অভাব, দলবদলের লজ্জাজনক খেলা, উপদলীয় কোন্দল প্রভৃতি কারণে জনগণ রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ সুযোগ গ্রহণ করেন চতুর সেনানায়ক জেনারেল আইয়ুব খান।
৩. সময়োচিত নির্বাচনের অভাব: ১৯৪৯ সালের পর থেকে পাকিস্তানে কখনোই সময়মতো নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। নির্বাচনে হেরে যাবার ভয়ে মুসলিম লীগ সরকার অনেক শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান করতেও সাহসী হয়নি। ফলে জনগণ হতাশ হয়ে পড়ে। এরই সুযোগ গ্রহণ করেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান ও রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মীর্জা।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির কারণ

৪. গভর্নর জেনারেলের অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ: ১৯৪৭ সাল থেকেই গভর্নর জেনারেলগণ অন্যায় ও অযাচিতভাবে মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। গোলাম মোহাম্মাদ এবং ইস্কান্দার মীর্জার ষড়যন্ত্র, মন্ত্রিসভা ও আইনসভার কাজে অন্যায় হস্তক্ষেপ পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। এরূপ অবস্থায় ইস্কান্দার মীর্জাকে লেলিয়ে দিয়ে সহজেই সেনানায়ক আইয়ুব খান সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

৫. নেতৃবৃন্দের সহনশীলতার অভাব: ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনুদার মনোভাব বিশেষ করে সহনশীলতার অভাবও পাকিস্তানে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে। বিশেষ করে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলী হত্যার বিষয়টি সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের পথকে প্রশস্ত করে।

৬. আওয়ামী লীগের নির্বাচনে বিজয়ের সম্ভাবনা: ১৯৫৯ সালে যে নির্বাচন হবার কথা ছিল তা অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগের বিজয় লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। তাই এ নির্বাচনকে প্রতিহত করার জন্য পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠীর মনে সামরিক শাসন জারি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৭. সেনাবাহিনীর ক্ষমতালাভের বাসনা: পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিশেষ করে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করে আসছিলেন। ১৯৫৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থান ছিল মূলত জেনারেল আইয়ুব খানের নেতৃত্বাধীন এক শ্রেণির সেনাকর্মকর্তার ক্ষমতা দখলের সুচিন্তিত পরিকল্পনারই পরিণতি।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির ফলাফল ছিল ভয়াবহ ও সুদূর প্রসারী। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো:

১. বারবার সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি: ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির ফলে পাকিস্তানের রাজনীতিতে সামরিক বাহিনীর প্রত্যক্ষ একচ্ছত্র আধিপত্য ও একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে পাকিস্তানে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠার ভবিষ্যৎ ক্ষেত্র তৈরি হয়ে যায়। সেনাপ্রধানরা সুযোগ পেলেই পরবর্তীতে সামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ বা নজীর পেয়ে যান।
২. সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত: এ সামরিক শাসনের ফলে পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা বিশেষ করে সংসদীয় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা ব্যাহত হয়।
৩. রাজনৈতিক সংগঠনের বিকাশ রুদ্ধ: সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়া হয়। ঘুষ, প্রলোভন ও ক্ষমতার অংশীদারিত্ব প্রদান করে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলগুলোতে ভাঙন সৃষ্টি করা হয় এবং ক্ষমতাসীন সামরিক শাসকের অনুকূলে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করে ক্ষমতাকে স্থায়ী করার সুচতুর কৌশল অবলম্বন করা হয়।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল

৪. রাজনৈতিক মূল্যবোধ ভুলুঠিত: সামরিক শাসনামলে রাজনৈতিক মূল্যবোধগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে পড়ে। রাজনীতিবিদদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সুকৌশলে বিনষ্ট করে দেয়া হয়। অনেক সময় তাঁদেরকে জনসমক্ষে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য দুর্নীতি ও মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে দেয়া হয়।
৫. রাজনৈতিক চক্রান্তের বিস্তার: রাজনৈতিক চক্রান্ত, দুর্নীতি ও দলবদলের মতো অনৈতিক কাজগুলো দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।
৬. প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে উপেক্ষা সামরিক শাসকগণ শক্তিশালী কেন্দ্রের সপক্ষে এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২১ ইন্সান্দার মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব
খানের ক্ষমতা দখল

টপিক ২১: ইস্কান্দার মীর্জাকে সরিয়ে জেনারেল আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	কখ গঘ

কুচক্রী প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করেছিলেন কয়েকজন শীর্ষ সামরিক জেনারেলের প্ররোচনা ও পরামর্শে। এদের মধ্যে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন তদানীন্তন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। মনে করা হয় যে, সামরিক শাসন জারি করে ক্ষমতা দখলের নীল নকশাটি ছিল তাঁরই। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে তিনি তার লক্ষ্য বাস্তবায়নে ব্যবহার করেছিলেন। এজন্য সামরিক শাসন জারির মাত্র ২০ দিনের মাথায় ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান চারজন জেনারেলকে পাঠান প্রেসিডেন্ট জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মীর্জার কাছে। সশস্ত্র এ চার জেনারেল প্রেসিডেন্ট মীর্জাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। ইস্কান্দার মীর্জা পদত্যাগ করেও নিষ্কৃতি পেলেন না। আইয়ুব খান এ কুচক্রীকে পাকিস্তানে রাখতে সাহস পেলেন না। এজন্যই পরদিন তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করা হলো। জেনারেল (অব.) মীর্জাকে সস্ত্রীক বিমানে উঠিয়ে দিয়ে লন্ডনে পাঠানো হলো। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! এ কুচক্রী জেনারেল (অব.) ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে সদা সচেষ্ট ছিলেন। যে জেনারেল আইয়ুব খানকে তিনি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক নিযুক্ত করেছিলেন, তিনিই তাকে শুধু ক্ষমতাচ্যুতই করেন নি বরং গ্রেপ্তার করে একদিন পর দেশের বাইরে চিরজীবনের জন্য নির্বাসনে পাঠান। ২৫ জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা কোনোদিনই আর দেশে ফিরতে পারেন নি।

২৮ অক্টোবর জেনারেল আইয়ুব খান এক সামরিক আদেশ জারি করে পাকিস্তানের 'প্রধানমন্ত্রী' পদটি বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং নিজেই রাষ্ট্রপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তিনি অপর এক ঘোষণাবলে ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব ঘোষণাকে বাতিল করে দেন। ২৭ পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবরেই তিনি ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি মন্ত্রিসভা গঠন করেন।

জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন ও দমন-নিপীড়ন

চতুর ও উচ্চাভিলাষী জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল এবং তা চিরস্থায়ী করার জন্য নীলনকশা অনুযায়ী অগ্রসর হতে থাকেন। সস্তা জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন লাভের জন্য তিনি কঠোর হাতে দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক করে তুলতে সচেষ্ট হন। মুনাফালোভী মজুতদার, আড়তদার, ব্যবসায়ীরা প্রাণভয়ে দ্রব্যমূল্যকে স্বাভাবিক রাখতে সচেষ্ট হন। প্রশাসনিক রদবদল ঘটিয়ে তিনি জনগণকে এরূপ ধারণা দিতে সচেষ্ট হন যে, খুব শীঘ্রই তিনি দেশে আমূল পরিবর্তন সাধন করবেন। সেনাবাহিনীর ভয়ে জনগণ ঝোপঝাড় জঙ্গল কেটে বাড়িঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে উদ্যোগী হন। এ সবে ফলে আইয়ুব খান এবং তার সামরিক শাসন সাধারণ মানুষের কাছে সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ করে। সামরিক শাসন বহাল থাকায় রাজনৈতিক নেতারা ভয়ে মিটিং মিছিল করতে পারছিলেন না, সংগঠিত হতে পারছিলেন না। বরং উল্টো জেনারেল আইয়ুব খান প্রচারযন্ত্রের সাহায্যে একচেটিয়াভাবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে বিমোদগার করেই চলছিলেন।

জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন ও দমন-নিপীড়ন

তিনি পাকিস্তানের সকল সংকটের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের অসততা ও দুর্নীতিকেই দায়ী করেন। সাধারণ জনগণের একটি বড় অংশই আইয়ুব খানের এ মিথ্যা ও একপেশে বক্তব্য দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। আইয়ুব খান রাজনৈতিক নেতাদের চরিত্র হনন করে চিরতরে রাজনীতির মাঠ থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী, মালিক ফিরোজ খান নুনসহ ১৫০ জন সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী এবং ৬০০ জন সাবেক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির অভিযোগ উপস্থাপন করে তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তাছাড়াও দেশের শীর্ষ নেতাদেরকে পাইকারি হারে গ্রেপ্তার করা হয়।

জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন ও দমন-নিপীড়ন

পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকজন জনপ্রিয় নেতাসহ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ এবং প্রখ্যাত আইনজীবী, সংবাদপত্র প্রকাশক ও রাজনীতিবিদ হামিদুল হক চৌধুরীসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৮ আইয়ুব খান এসব রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করেই ক্ষান্ত হননি, দীর্ঘদিন তাঁদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিতাড়নের পদক্ষেপও গ্রহণ করেন। এজন্য তিনি ১৯৫৯ সালে 'নির্বাচিত সংস্থাসমূহ (অযোগ্যতা) আদেশ, ১৯৫৯' (Elective Bodies Disqualification Order 1959) এবং 'সরকারি পদ লাভের অযোগ্যতা সংক্রান্ত আদেশ' (Public Office Disqualification Order) নামে দুটি আদেশ জারি করেন। ২৯ এ দুটি আদেশ সংক্ষেপে EBDO এবং PODO নামে পরিচিত হয়। 'পোডো' (PODO)-তে বলা হয় যে, যারা দুর্নীতির কারণে সাজাপ্রাপ্ত হয়েছেন তারা ১৫ বছরের মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক পদে নির্বাচন করতে পারবেন না। অপরদিকে 'এবডো' (EBDO) তে বলা হয় যে, বিশেষ আদালতে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তি বা রাজনীতিবিদ ইলেকটিভ বডি নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না বলে সম্মত হলে শুধুমাত্র তখন বিচার এড়াতে পারবেন। 'এবডো' নামক কালাকানুন বা আদেশ জারি করে আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান, সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফফার খান, মিঞা মমতাজ দৌলতানা, সিন্ধুর নেতা এম. এ. খুরোসহ অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকে অভিযুক্ত করা হয়।

জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন ও দমন-নিপীড়ন

সোহ্রাওয়ার্দীসহ অনেক রাজবন্দী নেতার বিরুদ্ধে 'হেবিয়াস কর্পাস' রীট মামলা দায়ের করা হয়। আইয়ুব খানের প্রধান লক্ষ্য ছিল হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ও তাঁর অনুসারী আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে রাজনৈতিক অঙ্গন থেকে বিতাড়িত করা বা দূরে সরিয়ে রাখা। এ দুটিতে কেউ অভিযুক্ত প্রমাণিত হবার অর্থ হলো অভিযুক্ত ব্যক্তি ১৯৬৬ সালের ৩১ ডিসেম্বরের পূর্বে দেশের কোনো 'Elective Body'-এর সদস্য হবার ক্ষেত্রে অযোগ্য বলে গণ্য হবেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান শুধুমাত্র ১৯৬৪-৬৫ সালেই প্রায় ৫০০ জন বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকে গ্রেপ্তার করেন। ১৯৬২ সালের এপ্রিলে 'জাতীয় পরিষদ' (কেন্দ্রীয় আইনসভা) এবং ৬ মে প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠান করলেও আইয়ুব খান সামরিক আইন প্রত্যাহার করেননি। ১৯৬২ সালে তিনি 'রাজনৈতিক দলবিধি' 'Political Parties Ordinance' জারি করে এতে বিধান করেন যে, রাজনীতিবিদরা ইচ্ছেমত কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন না।

জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন ও দমন-নিপীড়ন

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থি ও কম্যুনিষ্ট নেতাদেরকে সহ্য করতে পারতেন না। যখনই এঁরা পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কথা বলতেন, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য সম্পর্কে কথা বলতেন, নিজেদের ন্যায্য হিস্যা দাবি করতেন, সেনাশাসন প্রত্যাহার করে অনতিবিলম্বে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তন করার কথা বলতেন, তখনই আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে ভারতের চর, দেশদ্রোহী, বেঈমান বলা হতো এবং বামপন্থিদেরকে 'রাশিয়ার দালাল', 'নাস্তিক', 'মুরতাদ', 'দেশদ্রোহী' বলা হতো। এঁদের বিরুদ্ধে হুলিয়া, জেল-জুলুম, নিপীড়ন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান '৬ দফা কর্মসূচি' ঘোষণা করলে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম বাংলার কম্যুনিষ্ট নেতাদের পরামর্শে 'বৃহত্তর বাংলা' গঠনের জন্যই এ কর্মসূচি তৈরি করা হয়েছে। ৩০

জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক স্বৈরশাসন ও দমন-নিপীড়ন

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান তার শাসনামলে কেন্দ্রীয় সিভিল সার্ভিসের (CSP) ১৩ জন, ফরেন সার্ভিসের ৩ জন, পুলিশ সার্ভিসের ১৫ জন এবং প্রাদেশিক সার্ভিসের (EPCS ও WPCS) মোট ১৬৬২ জনকে বরখাস্ত কিংবা বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান করেন। ৩১ বেসামরিক আমলা প্রশাসনের অনেক স্তরে নিযুক্ত করা হয় সামরিক কর্মকর্তাদের। ৩২ যেসব পত্রিকা সেনাশাসনের বিরোধিতা করতো, স্বায়ত্তশাসনের কথা লিখতো বা প্রচার করতো, সেসব পত্রিকার উপর আইয়ুব খানের ছিল প্রচণ্ড বিদ্বেষ। এজন্য তিনি ইত্তেফাক, সংবাদ ও Observer পত্রিকাকে কালো তালিকাভুক্ত করেন। এসব পত্রিকায় সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং এসব পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিকদের বিদেশ ভ্রমণে বাধা প্রদান করা হয়।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২২ আইয়ুব খানের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিদ্বেষ

টপিক ২২: আইয়ুব খানের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি বিদ্যে

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

ক. রোমান হরফে বাংলা

সামরিক শাসন জারির পর থেকেই আইয়ুব খান পাকিস্তানে জাতীয় সংহতি দৃঢ় করার লক্ষ্যে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো বাংলা ও উর্দুর সংমিশ্রণে একটা নতুন ভাষা তৈরির অপচেষ্টা। প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান বাঙালি ও বাংলা ভাষা-কোনোটাকেই পছন্দ করতেন না। তার মতে, এককভাবে বাংলা ও উর্দু কোনোটাই সমগ্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। এজন্য তিনি বাংলা-উর্দুর জগাখিচুড়ির সপক্ষে যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেন যে, “এ ধরনের একটি মাধ্যম উদ্ভব করতে হলে আমাদেরকে বাংলা ও উর্দুর মধ্যকার সাধারণ উপাদানগুলো খুঁজে বের করতে হবে এবং সেগুলোকে একটি মাত্র সাধারণ লিখন রীতির মাধ্যমে একত্রে বর্ধিত হতে দিতে হবে।

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের এ তোষলকী অপচেষ্টা বাস্তবায়নে মাঠে নামে 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' এবং বাংলা একাডেমী। তারা রোমান হরফে বাংলা বর্ণমালাকে সাজাতে চেষ্টা করে। এর সাথে আর একটি অপচেষ্টাও চালানো হয় এবং তা হলো বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংশোধন ও পরিবর্তনের মাধ্যমে ইসলামিকরণ বা পাকিস্তানিকরণ। বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের 'চল্ চল্ চল্' নামক বিখ্যাত কবিতায় ছিল "নবনবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান।" এখানে 'মহাশ্মশান' কেটে দিয়ে করা হয় "সজীব করিব গোরস্থান।" আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-একটি জনপ্রিয় ছড়া ছিল-

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভাল হয়ে চলি।"

আইয়ুব-মোনায়েম খানের বশংবদ ও তোষামোদকারী বাঙালি কবিরা এটি সংশোধন করে লিখলেন-

"ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি সারাদিন যেন আমি নেক হয়ে চলি।"

এমনকি ছাত্রছাত্রীদের চালচলন, পোশাক-পরিচ্ছদেও মুসলমানিত্ব বা পাকিস্তানিত্বের ছাপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদেরকে শাড়ির পরিবর্তে সালোয়ার কামিজ পরতে এবং কপালে টিপ না পরার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়।

এসব বিকৃতির বিরুদ্ধে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী সমাজও প্রতিবাদ জানাতে থাকে। ১৯৫৯ সালে সর্বদলীয় ছাত্রসংগঠন আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে ড. শহীদুল্লাহ্ এসব বিকৃতির বিরুদ্ধে বিশেষ করে রোমান হরফ প্রবর্তনের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

আইয়ুব সরকার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালাতেও কুণ্ঠিত হয়নি। ১৯৬০ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত 'অগ্রগামী'র অনুষ্ঠানে যখন রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী জাহেদুর রহিম 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি পরিবেশন করছিলেন তখন এন. এস. এফ. ও ইসলামি ছাত্রসংঘ যৌথভাবে হামলা চালায়।

খ. রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী পালন

ষাটের দশকের শুরুতে, আইয়ুব খানের সামরিক শাসনামলে সরকারের মদদে রবীন্দ্র বর্জনের প্রচেষ্টায় কিছু ভাড়াটে বুদ্ধিজীবী বক্তব্য প্রদান করতে থাকেন। ঢাকা জেলা কাউন্সিল হলে এরূপ একটি আলোচনায় অধ্যাপক আব্দুল মান্নান তালিব, দেওয়ান আব্দুল হামিদ, মাওলানা মহিউদ্দীন, অধ্যাপক গোলাম আজম প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে বিমোদগার করে।

অপরদিকে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীগণ এবং ছাত্রসমাজ রবীন্দ্র চর্চায় বাঙালি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আরো বেশি সচেষ্ট হন। এমনকি মফস্বল শহরে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব কমিটি' গঠিত হতে থাকে। ডাকসু ভিপি জাহানারা বেগম এবং সাধারণ সম্পাদক অমূল্য চক্রবর্তীর (মতান্তরে রায়) উদ্যোগে কার্জন হলে 'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী' অনুষ্ঠান হয়। কার্জন হলের ডাকসু আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্য সে সময়ের প্রখ্যাত ছাত্র ইউনিয়ন নেতা আনোয়ার জাহিদ ও জহির রায়হানকে প্রেরণ করা হয়।

'রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী' উদ্যাপনের জন্য কেন্দ্রীয় যে কমিটি গঠন করা হয় তার সভাপতি করা হয় ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদকে এবং সম্পাদক করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. খান সরওয়ার মুর্শিদকে। কারিগরি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত তাঁদের প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে স্বয়ং প্রধান বিচারপতি ইমাম হোসেন চৌধুরী অংশগ্রহণ করেন। রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর এসব আয়োজিত অনুষ্ঠানের ফলে বাঙালি জনগণ আরো বেশি করে রবীন্দ্র অনুসারী হয়ে উঠতে থাকেন। সরকারের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সবার নিকট উন্মোচিত হতে থাকে।

ঢাকা বিমান বন্দরে মোনায়েম খান লাঞ্চিত

জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হলে ছাত্রনেতৃবৃন্দ নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন যেন তাঁরা আইনসভায় গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুসলিম লীগ নেতা মোনায়েম খান ময়মনসিংহ থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়ে এক বিবৃতিতে রাজবন্দীদের 'দেশদ্রোহী' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। শুধু তাই নয়, তিনি দাবি করেন যে, এসব দেশদ্রোহীকে যেন মুক্তি দেওয়া না হয়। ছাত্ররা রাজবন্দীদের মুক্তির দাবি উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য মোনায়েম খানের বাসায় যায়। কিন্তু দীর্ঘ অপেক্ষার পরও তাঁর সাক্ষাৎ পায়নি। সংসদ অধিবেশনে যোগদানের জন্য মোনায়েম খান বিমান বন্দরে পৌঁছানোর দিন ছাত্ররা সেখানে ছাত্র-জমায়েত করে। 'মোনায়েম খাঁ যখন বিমান বন্দরের লাউঞ্জে আসেন তখন প্রথমেই উপস্থিত ছাত্রদের দ্বারা এক দফা 'ধোলাই-পর্ব' হজম করেন। এরপর ছাত্রনেতা কাজী জাফর আহমদ তাঁর শেরওয়ানীর কলার চেপে ধরে এক লম্বা বক্তৃতা দেওয়া শুরু করেন। এক পর্যায়ে ধস্তাধস্তিতে তাঁর মাথার টুপি পর্যন্ত পড়ে যায়। অবস্থা অত্যন্ত নাজুক হয়ে উঠলে উপস্থিত সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এবং তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া মধ্যস্থতা করে মোনায়েম খানকে এ যাত্রায় রক্ষা করেন। মোনায়েম খান কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং দু'মাসের মধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হয়ে প্রাপ্য পুরস্কার নিয়ে স্বদেশে ফেরেন।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২৩ শরীফ শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন

টপিক ২৩: শরীফ শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৬ জন এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে ৪ জন সদস্য নিয়োগ করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক (আইয়ুব খানের শিক্ষক) এম. এম. শরীফকে এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তান থেকে যে ৪ জনকে সদস্য নিয়োগ করা হয় তাঁরা হলেন-১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, ২. ঢাকা মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট আব্দুল হক, ৩. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আতোয়ার হোসেন এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ ড. এ রশীদ। এ শিক্ষা কমিশন "শরীফ কমিশন" নামে পরিচিত। কমিশন ১৯৫৯ সালের ২৬ আগস্ট অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন হিসেবে কমিশনের সুপারিশসমূহ রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করে। এ কমিশনে শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে বলা হয় যে, "আমাদের জাতীয় জীবনে ইংরেজির বিরাট প্রয়োজনীয়তা আছে এবং সেজন্য ষষ্ঠ শ্রেণি হতে ডিগ্রিস্তর পর্যন্ত ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক পড়া হিসেবে শিক্ষা দিতে হবে। ৪৮ কমিশনের রিপোর্টে উর্দু সম্পর্কে সুপারিশ করা হয় যে, "উর্দুকে মুষ্টিমেয় লোকের পরিবর্তে জনগণের ভাষায় পরিণত করতে হবে।"

শিক্ষা কমিশন পাকিস্তানের জন্য একটি অভিন্ন বর্ণমালার সুপারিশ করে বলে যে, "পাকিস্তানের জাতীয় ভাষার জন্য যদি একটি সাধারণ বর্ণমালা প্রবর্তন করিতেই হয় তাহা হইলে পবিত্র কোরান যাতে লেখা এবং যা সকল মুসলমানই পাঠ করে সেই আরবীয় (না) দাবি কিছুতেই উপেক্ষা করা যায় না। সবশেষে শিক্ষা কমিশন রোমান হরফের সুপারিশ করে বলে যে, "আমরা মনে করি যে, একদিকে উর্দু ও বাংলা বর্ণমালাসমূহের সংস্কার ও উন্নয়ন করা উচিত এবং অপরদিকে রোমান বর্ণমালায় এমন একটি আকারের উদ্ভব ও মান নির্ধারণ করা উচিত যা পাকিস্তানি ভাষাসমূহকে অক্ষরান্তর করার উপযোগী হবে"।

কমিশন সুপারিশ করে যে, শিল্পে মূলধন বিনিয়োগের মতোই শিক্ষার অর্থ ব্যয়ও এক ধরনের বিনিয়োগ।.... শিক্ষা সন্তায় পাওয়া সম্ভব নয়। ৫১ শরীফ কমিশন 'অবৈতনিক শিক্ষার' ধারণাকে 'অবাস্তব কল্পনা' বলে পরিহাস করে এবং সর্বজনীন শিক্ষার গণদাবিকে ব্যঙ্গ করে বলে যে, "শিক্ষার জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে খুব সামান্যই অর্থ সাহায্য পাওয়া গিয়েছে এবং আরও স্কুলের জন্য জনসাধারণ যতটা দাবি জানিয়ে থাকে তার অনুপাতে ব্যয় বহনের অভিপ্রায় তাদের কখনই দেখা যায় নাই। অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল ও নামমাত্র বেতনের মাধ্যমিক স্কুল স্থাপনের জন্য সরকারের উপর নির্ভর করাই জনসাধারণের রীতি। তাহাদিগকে উপলব্ধি করিতে হবে যে অবৈতনিক শিক্ষার ধারণা বস্তুত অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় বেশ কয়েকটি ছাত্রসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রসভার পাশাপাশি এ সময় প্রতিদিন ছাত্ররা বিক্ষোভ মিছিল বের করে। ১০ সেপ্টেম্বর সচিবালয়ের সামনে অবস্থান ধর্মঘট কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাফেটারিয়ায় ছাত্রনেতাদের যে আলোচনা সভা বসে তাতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা কলেজ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক কাজী ফারুক আহমদ, জগন্নাথ কলেজ ছাত্রসংসদের সহ-সভাপতি আব্দুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম, ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী, ছাত্রনেত্রী নাজমা বেগম, কায়েদে আজম (বর্তমানে সোহ্রাওয়ার্দী কলেজ) কলেজের সহ-সভাপতি নূরুল আরেফিন খান, নারায়ণগঞ্জ তোলারাম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আজীজ বাগমার, ডাকসুর প্রতিনিধি এনায়েতুর রহমান প্রমুখ। ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার বিরাট ছাত্রসমাবেশে বক্তৃতা করেন ছাত্রলীগ নেতা শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ। এ দুই অনলবর্ষী ছাত্রনেতার বক্তব্যে সেদিন ছাত্রসমাজ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং বিক্ষোভ মিছিল করে ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। ১৫ আগস্ট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন ছাত্র বিক্ষোভ চলতে থাকে। ১০ সেপ্টেম্বর সরকার ছাত্র আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দীকে জেল থেকে ছেড়ে দেন। ১৬ সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহ্রাওয়ার্দী ঢাকায় আসেন। ঢাকা বিমানবন্দরে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর খুব ভোর থেকেই ছাত্ররা রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং শুরু করে। পিকেটারদের দ্বারা কার্জন হলের সামনে মোনায়েম খানের মন্ত্রিসভার সদস্য খাজা হাসান আসকারীর মার্সিডিজ গাড়ি ভস্মীভূত হয়। পুলিশের ২/৩টি জীপ গাড়িতে ছাত্ররা আগুন জ্বালিয়ে দেয়। সকাল ৯টার মধ্যেই সমস্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা লোকে-লোকারণ্য হয়ে যায়। নবাবপুর রেলক্রসিং থেকে সদরঘাট পর্যন্ত রাস্তাঘাট ছিল বিক্ষোভকারীদের দখলে। মাঝে মাঝেই তাদের সাথে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া এবং পুলিশের নির্বিচার গ্রেপ্তার চলছিল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে কে বা কারা সংবাদ জানায় যে, নবাবপুরে গুলিতে বেশ কজন শহীদ হয়েছে। এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানরত ছাত্রজনতা মারমুখী হয়ে উঠে। এরপর কাজী জাফর আহমদ, সিরাজুল আলম খান, মহিউদ্দিন আহমদ, রেজা আলী, হায়দার আকবর খান রনো, রাশেদ খান মেনন, আইয়ুব রেজা চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি জঙ্গী মিছিল বের হয়। মিছিলটি হাইকোর্ট পেরিয়ে আব্দুল গণি রোডে প্রবেশ করামাত্র মিছিলের পিছনে পুলিশ বিনা উস্কানিতে গুলিবর্ষণ করে। এ গুলিতে বাবুল, গোলাম মোস্তফা (ই. পি. আর, টি, সি বাস কন্ডাকটর) সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে এবং ওয়াজিউল্লাহসহ অনেকেই আহত হয়। ওয়াজিউল্লাহ পরদিন (১৮ সেপ্টেম্বর) হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করে। তবে পুলিশের গুলিতে ছাত্ররা ভয়ে ভীত না হয়ে আরো জঙ্গী রূপ ধারণ করে মিছিলসহ এগিয়ে যেতে থাকে। পুলিশ রথখোলার সামনে মিছিলের পথরোধ করে (ব্যারিকেড সৃষ্টি)।

পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙ্গে তখন জগন্নাথ কলেজের দিক থেকে অপর একটি বৃহদাকার মিছিল এগিয়ে আসছিলো। রথখোলার মোড়ে পুলিশ ছাত্রজনতাকে লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি ও টিয়ারগ্যাস ছুঁড়তে থাকে। ছাত্ররা ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এখানে অসংখ্য ছাত্র-জনতা আহত হয় এবং প্রায় ২৫০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুড়িগঙ্গার ওপার থেকেও মানুষ এ বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করে। লগি হাতে নৌকার মাঝীদেরকেও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। পুলিশ ও সেনাবাহিনী সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলাকা ঘিরে রাখে। মেডিকেল কলেজে এক অবর্ণনীয় দৃশ্যের সৃষ্টি হয়। 'আহত আর নিহতদের রক্তে সমস্ত মেঝে ভেসে যাচ্ছিলো। শহীদদের আত্মীয়-স্বজনরা দাফনের জন্য লাশ নিতে চাইলে সেনাবাহিনী বাধা দেয় এবং লাশ গায়েব করার চেষ্টা করতে থাকলে উপস্থিত বিক্ষুব্ধ জনতার বাধা পায়। লাশ মর্গ থেকে সরিয়ে ছাত্ররা পাহারার ব্যবস্থা করে।

১৭ সেপ্টেম্বর (সোমবার)-এর পুলিশ-সেনাবাহিনীর দমন নীতির বিরুদ্ধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবুর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া), মাহমুদ আলী, মোহসিন উদ্দিন আহমেদ (দুদু মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), শাহ আজিজুর রহমান-এ ১০ জন শীর্ষ নেতা বিবৃতি প্রদান করেন। তাঁরা অবিলম্বে হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি গঠন, গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি প্রদান এবং আহতদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ সারা প্রদেশে ৩ দিন ব্যাপী 'শোক দিবস' ঘোষণা করে। ১৮ সেপ্টেম্বর সকাল ৮ টায় সলিমুল্লাহ হলে আয়োজিত গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন বেলুচিস্তানের প্রগতিশীল নেতা গাউস বক্স বেজেঞ্জো এবং খায়ের বক্স মারী। মোনাজাত শেষে বিরাট শোক মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ২৪ সেপ্টেম্বর পল্টন ময়দানে ছাত্রদের উদ্যোগে প্রথম জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশাল এ ছাত্র জনসভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, ছাত্র ইউনিয়ন নেতা কাজী জাফর আহমদ, ছাত্রশক্তি নেতা মীজানুর রহমান শেলী, এন এস এফ নেতা আবুল হাসনাত প্রমুখ। ২৮ অক্টোবর গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা কলেজে শিক্ষা সপ্তাহ উদ্বোধন করতে গেলে ছাত্ররা তাঁকে কালো পতাকা প্রদর্শন করে। আইয়ুব খান এ সময় ছাত্র আন্দোলন প্রশমিত করার জন্য শহীদ সোহরাওয়ার্দীর স্মরণাপন্ন হন। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে সরকার 'শরীফ কমিশন' প্রদত্ত শিক্ষা প্রতিবেদন বাস্তবায়ন স্থগিত রাখার ঘোষণা প্রদান করে। এরপর ছাত্র আন্দোলন আপাতত স্তিমিত হয়ে পড়ে।

NDF গঠন

১৯৬২ সালের ৪ সেপ্টেম্বর সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আইয়ুব বিরোধী ও গণতন্ত্রের সপক্ষ শক্তিসমূহের একটি রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠিত হয়। এ ফ্রন্টের নামকরণ করা হয় National Democratic Front, যা সংক্ষেপে NDF নামেই সমধিক পরিচিতি অর্জন করে। NDF-এর সরকার বিরোধী তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত কর্মকাণ্ড রাজনীতি সচেতন মানুষকে আগ্রহী ও আশাবাদী করে তোলে। NDF-এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও মূল নেতা ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। NDF গঠিত হলে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান ভীত ও বিচলিত হয়ে পড়েন। এজন্যই NDF গঠনের মাত্র এক সপ্তাহ পর করাচিতে সোহরাওয়ার্দীকে 'জননিরাপত্তা আইনে' গ্রেপ্তার করা হয়। সোহরাওয়ার্দী এ সময় ছিলেন খুবই জনপ্রিয় নেতা। তাঁকে গ্রেপ্তার করায় সমগ্র পাকিস্তানে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এ সময় প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খান ঢাকা সফরে – এলে বিক্ষুব্ধ ছাত্রজনতা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব খান 'জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স' জারি করে নির্মমভাবে এ আন্দোলন দমনের চেষ্টা চালান। শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল মনসুর আহমদ, কফিলউদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, তাজউদ্দিন আহমদ, কোরবান আলী প্রমুখ প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া), প্রখ্যাত ছাত্রনেতা কাজী জাফর আহমেদ প্রমুখ আইয়ুব খানের দমননীতির শিকার হন এবং বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন।

এন. এস. এফ. নামক ছাত্র সংগঠনের সন্ত্রাসী কার্যক্রম

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোনায়েম খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করার পর তিনি ড. ওসমান গণিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ষাটের দশকে প্রেসিডেন্ট জেনারেল আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন এবং শরীফ কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললে মোনায়েম খান তা দমনের জন্য কৌশল খুঁজতে থাকেন। গভর্নর মোনায়েম খান ছাত্র অসন্তোষ দমনের জন্যই 'National Students Federation' (NSF) নামক ছাত্র সংগঠনটি পুনর্গঠন করেন। পুনর্গঠিত এ সংগঠনের মাধ্যমে সরকার সমর্থক একটি ছাত্রগোষ্ঠী গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। ভবিষ্যতে চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার লোভে কিছু ছাত্র এ সংগঠনে যোগদান করলেও তা যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারেনি। বরং অল্পদিনের ভিতরেই এ ছাত্রসংগঠনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে। ১৯৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষক ড. আবু নসর মাহমুদ ক্ষমতাসীন সরকারের মদদপুষ্ট NSF-এর গুণ্ডাবাহিনীর হাতে প্রহৃত ও লাঞ্চিত হন। NSF-এর সন্ত্রাসী কার্যকলাপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়ে ঢাকা শহরসহ দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিস্তৃত হয়। ষাটের দশকের শেষদিকে 'NSF' এবং 'সন্ত্রাস' সমার্থক শব্দ হিসেবে কুখ্যাতি অর্জন করে। এর ফলে NSF নামক ছাত্র সংগঠনটি সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও সচেতন জনগণের মনে ঘৃণার সৃষ্টি হয়। ষাটের দশকের শেষদিকে এ সন্ত্রাসী সংগঠনটি ছাত্র-জনতার রোষানলে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২৪ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

টপিক ২৪: পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির শুরুতে পূর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা সবুজ, শস্য শ্যামলা, ধনে-ধান্যে পুষ্পে ভরা একটি প্রদেশ। এ প্রদেশটির মানুষ ছিল সহজ-সরল এবং অনেকটা সচ্ছল। তারা উচ্চাভিলাষী ও লোভী ছিল না। 'সোনালী আঁশ' পাটের জন্য পূর্ব বাংলা ব্রিটিশ আমল থেকেই সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জাতীয় আয়ের সিংহভাগই আসতো এই 'সোনালী আঁশ' বলে খ্যাত পাট রপ্তানির অর্থ থেকে। ১৯৪৭-৪৮ সালে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫২% ছিল পূর্ব বাংলার অবদান।

কিন্তু ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক শ্রেণি বিশেষ করে রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী ও আমলা শ্রেণি 'পূর্ব বাংলা' প্রদেশকে পাকিস্তানের একটি 'উপনিবেশে' (Colony) পরিণত করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। অত্যন্ত সুকৌশলে পূর্ব বাংলাকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা হতে থাকে। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে গড়ে তোলা হয় সামরিক, রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের পাহাড়। নিম্নে এ বৈষম্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

রাজনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৪০ সালের 'লাহোর প্রস্তাবের' ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম মূল প্রস্তাব ছিল 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' (Provincial autonomy)। কিন্তু সৃষ্টির পর থেকেই পাকিস্তানের মুসলিম লীগ দলীয় শাসকগণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার কথা চেপে যান। তারা তখন 'শক্তিশালী কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় মশগুল হয়ে পড়েন। তাদের এরূপ ভুল ধারণা জন্মে যে, প্রদেশগুলোকে স্বায়ত্তশাসন দিলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার দুর্বল হয়ে যাবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মুসলিম লীগের তরুণ ও প্রগতিশীল অংশ বাধ্য হয়ে ১৯৪৯ সালে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এ দলটি এবং বামপন্থি দল ও গোষ্ঠীগুলো স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা শুরু করলে তাদেরকে বিধর্মী, কাফের, ভারতের দালাল, রাশিয়ার দালাল, ভারতের গুপ্তচর বা এজেন্ট, রাষ্ট্রদ্রোহী বলে সমালোচনা এবং নির্যাতন নিপীড়ন করা হয়।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭-৫৮ সাল পাকিস্তানের ৪ জন রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার এবং তিনিও ছিলেন উর্দুভাষী (খাজা নাজিমুদ্দিন)। এ সময়কালে ৭ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার এবং এদের মধ্যে একজন ছিলেন উর্দুভাষী (খাজা নাজিমুদ্দিন)। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের প্রথম মন্ত্রিসভার ১৮ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন পূর্ব বাংলার এবং এ ৪ জনের মধ্যে আবার একজন ছিলেন উর্দুভাষী (খাজা শাহাবুদ্দিন)। ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পূর্ব বাংলার ৪ জন গভর্নরের মধ্যে মাত্র ১ জন ছিলেন বাঙালি। এসব গভর্নর ছিলেন পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত ব্যক্তি এবং তাঁরা অন্যায় ও অযাচিতভাবে পূর্ব বাংলার নির্বাচিত প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়গুলো সব সময় অবাঙালিদের দখলে থাকতো। ৫৭ প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ১৯৫১ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হলে খাজা নাজিমুদ্দিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন। পাঞ্জাবি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ (প্রাক্তন আমলা) খাজা নাজিমুদ্দিনকে পাশ কাটিয়ে নিজেই হয়ে উঠেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খাজা নাজিমুদ্দিন প্রধানমন্ত্রী হয়েও ঠুঠো জগন্নাথে পরিণত হন। উর্দুভাষী খাজা নাজিমুদ্দিনের অপরাধ ছিল একটিই এবং তা হলো তাঁর জন্ম হয়েছিল ঢাকা শহরে বা পূর্ব বাংলায়।

রাজনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভায় বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ছিল ২৫% থেকে ৪৭% মধ্যে। এ সময়কালে ২২১ জন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৯৫ জন। জেনারেল আইয়ুব খানের শাসনামলে (১৯৫৮-১৯৬৯) পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মোট ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ২২ জন।

রাজনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব (১৯৪৭-৭১)^{৫৮}

সরকার প্রধান	কোন প্রদেশের অধিবাসী	সময়কাল	মোট মন্ত্রীর সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তানির সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানি বান্ধালির সংখ্যা	বান্ধালিদের শতকরা হার
নবাবজাদা লিয়াকত আলী খান	পশ্চিম পাকিস্তান	১৯৪৭-১৯৫১	১৯	১৩	৬	৩১.২
খাজা নাজিমুদ্দিন	পূর্ব পাকিস্তান (উর্দুভাষী)	১৯৫১-১৯৫৩	১৫	৯	৬	৪০.০
নবাব মোহাম্মদ আলী (বগুড়া)	পূর্ব পাকিস্তান	১৯৫৩	১৪	৯	৫	৩৫.০
ঐ	ঐ	১৯৫৪-১৯৫৫	১৬	৯	৭	৪৪.০
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী	পশ্চিম পাকিস্তান	১৯৫৫-১৯৫৬	১৭	১০	৭	৪১.০
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী	পূর্ব পাকিস্তান	১৯৫৬-৫৭	১৪	৬	৮	৫৭.০
আই.আই. চুন্দ্রিগড়	পশ্চিম পাকিস্তান	১৯৫৭	১৬	৯	৭	৪৪.০

রাজনৈতিক বৈষম্য

মালিক ফিরোজ খান নুন	ঐ	১৯৫৭-১৯৫৮	২৭	১৫	১২	৪৪.৫
জেনারেল আইয়ুব খান	ঐ	১৯৫৮-৬০	১২	৯	৩	২৫.০
ঐ	ঐ	১৯৬০-১৯৬২	১৬	১১	৫	২৬.০
ঐ	ঐ	১৯৬২-১৯৬৫	১৭	৯	৮	৪৭.০
ঐ	ঐ	১৯৬৫-১৯৬৯	১৭	১১	৬	৩৫.০
জেনারেল ইয়াহিয়া খান	ঐ	১৯৬৯-১৯৭১	১১	৬	৫	৪৫.৮
মোট			২২১	১২৬	৯৫	৪২.৯৮

প্রশাসনিক বৈষম্য

প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পাকিস্তানের দু অংশের মধ্যে ছিল বড় ধরনের বৈষম্য। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আমলা অর্থাৎ ICS ও IPS কর্মকর্তার সংখ্যা ছিল ৯৫ জন। এদের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ১ জন। ১৯৪৭-৬৬ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের প্রশাসনিক পদগুলোতে প্রথম শ্রেণির বাঙালি কর্মকর্তা ছিলেন ২০%, দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মচারী ২৬%, তৃতীয় শ্রেণির কর্মচারী ২৭% এবং চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ছিলেন মাত্র ৩০%। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে কর্মরত ৯৩ জন সচিবের মধ্যে সকলেই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের। ১৯ জন যুগ্ম সচিবের মধ্যে ১ জন এবং ৫৯ জন উপ-সচিবের মধ্যে ৪ জন ছিলেন পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তানের। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরিতে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা ছিল ৪২ হাজার অথচ পূর্ব বাংলার ছিল দুই হাজার একশত এবং তারা অধিকাংশেই ছিলেন নিম্নপদস্থ। বেতন বাবদ পশ্চিম পাকিস্তানিরা পেতেন ১১ কোটি ৪০ লক্ষ এবং বাঙালিরা পেতেন মাত্র ৬৫ লক্ষ টাকা। ১৯৪৮ থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত বেসামরিক উচ্চপদস্থ ৩৪৬ জন CSP কর্মকর্তাদের মধ্যে মাত্র ১২৬ জন ছিলেন বাঙালি। অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানিদের সংখ্যা ছিল যেখানে ৬৩.৬৩ ভাগ সেখানে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল ৬.৪ ভাগ মাত্র।

প্রশাসনিক বৈষম্য

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনে যে বৈষম্য বিরাজমান ছিল তা নিম্নে কয়েকটি ছকে দেখানো হলো :

ছক-১

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের CSP কর্মকর্তাদের তুলনামূলক পরিসংখ্যান (১৯৪৮-১৯৬৩)^{৫৯}

বছর	মোট কর্মকর্তার সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
		সংখ্যা	হার	সংখ্যা	হার
১৯৪৮	১৮	২	১১.২	১৬	৮৮.৯
১৯৪৯	২০	৯	৪৫.০	১১	৫৫.০
১৯৫০	২০	৬	৩০.০	১৪	৭০.০
১৯৫১	১১	৪	৩৬.৪	৭	৬৩.৬
১৯৫২	১৭	৫	২৯.৪	১২	৭০.৬
১৯৫৩	১৩	৩	২৩.১	১০	৭৭.৯
১৯৫৪	২৫	৭	২৮.০	১৮	৭২.০
১৯৫৫	১৭	৫	২৯.৪	১২	৭০.৬
১৯৫৬	২১	১১	৫২.৪	১০	৪৭.৬
১৯৫৭	২০	৭	৩৫.০	১৩	৬৫.০
১৯৫৮	২৪	১০	৪১.৭	১৪	৫৮.৩
১৯৫৯	২৪	১২	৫০.০	১২	৫০.০
১৯৬০	৩১	১০	৩২.৩	১৯	৬৩.৭
১৯৬১	২৭	১০	৩৭.০	১৭	৬৩.০
১৯৬২	২৭	১২	৪৪.৫	১৫	৫৫.০
১৯৬৩	৩১	১৩	৪১.৬৯	১৮	৫৮.১
মোট	৩৪৬	১২৬	৩৬.৪	২১৮	৬৩.৬

প্রশাসনিক বৈষম্য

ছক-২				
১৯৬২ সালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সচিবালয়ে উচ্চপদে বাঙালিদের অবস্থান ^{৬০}				
পদ /পদবি	মোট সংখ্যা	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা হার
সচিব	১৯	১৯	০	০
যুগ্ম-সচিব	৪৬	৩৯	৭	১৫
উপ-সচিব	১২৬	১০২	২৪	১৯
শাখা প্রধান	৭৬৩	৬৭৫	৮৮	১১
মোট	৯৫৪	৮৩৫	১১৯	১২

প্রশাসনিক বৈষম্য

ছক-৩

ফরেন সার্ভিস ও স্টেট ব্যাংকের চাকরিক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনামূলক অবস্থান^১

চাকরির ক্ষেত্র	সাল	মোট পদের সংখ্যা	পূর্ব বাংলা বা পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা হার
ফরেন সার্ভিস ক্যাডার	১৯৫৩	১১৯	৩৬	৮৩	৩১%
	১৯৬২	২৪০	৫০	১৯০	২০.৮%
স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান (কেন্দ্রীয় ব্যাংক)	১৯৫০	২০৬	৪১	১৬৫	১৯.৯%
	১৯৬৩	৭৫১	২৩৬	৫১৫	৩১.৪%

প্রশাসনিক বৈষম্য

ছক-৪

১ জানুয়ারি ১৯৬৫-তে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরিতে বৈষম্য^{৬২}

পদের প্রকৃতি	পূর্ব পাকিস্তান		পশ্চিম পাকিস্তান	
	পদের সংখ্যা	শতাংশ	পদের সংখ্যা	শতাংশ
গেজেটেড	১৩৩৮	২৬.৫	৩৭০৮	৭৩.৫
নন-গেজেটেড	২৬৩১০	২৪.১	৮২৯৪৪	৭৫.৯
সর্বমোট	২৭৬৪৮	২৪.২	৮৬৬৫২	৭৫.৮

প্রতিরক্ষা বা সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক বৈষম্যও ছিল চোখে পড়ার মতো। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্রিটিশদের মতোই মনে করতেন যে, বাঙালিরা অসামরিক জাতি। কাজেই এদেরকে সেনাবাহিনীতে স্থান দেয়া ঠিক হবে না। তাছাড়া বাঙালিদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র থাক, তারা যুদ্ধবিদ্যা শিখুক এটা মনের দিক থেকে পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষ মেনে নিতে পারতেন না। প্রতিরক্ষা বিভাগের সকল শাখার সদর দপ্তর ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রতিরক্ষা ট্রেনিং ইনস্টিটিউটগুলোও ছিল সেখানে। ইচ্ছে থাকলেও প্রতিরক্ষা সার্ভিসে নিয়োগ লাভ বাঙালিদের জন্য ছিল বেশ কঠিন। রিট্রুটিং বোর্ড দুটি গঠিত ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের নিয়ে। তারা সহসা বাঙালিদের অফিসার পদে নিয়োগ দিতে চাইতো না। এমনকি জওয়ান বা সাধারণ সিপাহী পদে নিয়োগের জন্য যে দৈহিক মাপ ও গঠন নির্ধারণ করা হয়েছিল তা খুব কম বাঙালির ছিল। স্বভাবতই প্রতিরক্ষা সার্ভিসে পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য বাড়তে বাড়তে তা হয় আকাশ ছোঁয়া। পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ (কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ) সদস্য, ড. আলীম আল রাজী তাঁর 'Process of Economic Disparity' নামক নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৬৩ সালে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে বাঙালিদের অংশ ছিল মাত্র শতকরা ৩.৯ জন। ৬৫ ১৯৬৮ সালে সামরিক বাহিনীতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অনুপাত ছিল সৈনিকদের ক্ষেত্রে ১.২৫ এবং অফিসারদের ক্ষেত্রে ১.৯০ ভাগ।

প্রতিরক্ষা বা সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনীতে যে প্রাদেশিক কোটা নির্ধারণ করা হয় সেখানে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং বাদবাকি ৫% সিন্ধু, বেলুচ ও বাঙালিদের মধ্য থেকে নিয়োগ করার বিধান চালু করা হয়েছিল।

১৯৬৬ সালের এক পরিসংখ্যানে লক্ষ্য করা যায় যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সে সময় ১টি জেনারেল, ২টি লেফটেন্যান্ট জেনারেল এবং ১৪টি মেজর জেনারেল পদের অর্থাৎ সর্বমোট ১৭টি পদের মধ্যে মাত্র একজন বাঙালি মেজর জেনারেল ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ঢাকা হলেও তিনি ছিলেন উর্দুভাষী অবাঙালি। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এ সময়ে পাঁচ লক্ষ সৈনিক ও সেনাকর্মকর্তার মধ্যে মাত্র বিশ হাজার জন ছিলেন বাঙালি সৈনিক-কর্মকর্তা। এর মূল কারণ ছিল বাঙালিদের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানিদের অবিশ্বাস। তারা সব সময় মনে করতো- বাঙালিদেরকে সামরিক দিক থেকে চিরদিন দুর্বল করে রাখাই হবে পাকিস্তানের জন্য মঙ্গলজনক। কেননা কোনোদিন যেন বাঙালিরা বিদ্রোহী হতে না পারে সেজন্যই তারা ছিল খুবই হিসেবি ও সাবধানী।

প্রতিরক্ষা বা সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা যেখানে সামরিক বাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যার ১ শতাংশের যোগানদাতা ছিল, পরবর্তীতে পরিস্থিতির কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি। ১৯৫৬ সালে মোট ৮৯৪ জন সেনা-অফিসারের মধ্যে মাত্র ১৪ জন ছিল পূর্ব পাকিস্তানি। নৌ-বাহিনীতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল ৫৯৩ জনের মধ্যে ৭ জন এবং বিমানবাহিনীতে ৬৪০ জন অফিসারের মধ্যে ৮০ জন। ১৯৬৫ সালে সমগ্র পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে বাঙালিদের সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩,০০০। ৬৮ ১৯৬৪-৬৫ সালে সেনাবাহিনীর মোট ৮টি ডিভিশনে সেনা সংখ্যা ছিল ২,৩০,০০০ জন, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর আনুমানিক সদস্য সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৭,০০০ এবং ১৭,০০০-২৫,০০০ জন। ৬৯ ১৯৬৫ সালে মোট ৬,০০০ সেনা অফিসারের মধ্যে মাত্র ৩০০ জন ছিল বাঙালি।

স্থল বাহিনীর মতো নৌবাহিনীতেও বাঙালির প্রতি বৈষম্যের একই চিত্র দৃশ্যমান হয়। নৌবাহিনীতে ১৯% টেকনিক্যাল লোক ছিল বাঙালি এবং বাকি ৮১% ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি, নন-টেকনিক্যাল লোকের মধ্যে বাঙালি ছিলেন ৯%। বিমান বাহিনীতে মাত্র ১১% বাঙালি পাইলট অফিসার এবং ১.৭% বাঙালি টেকনিশিয়ান ছিলেন। পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের (PIA) মোট ৭২৮০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে বাঙালি ছিলেন ২৮০ জন এবং পিআইএ'র জন পরিচালকের মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন বাঙালি এবং ৫ জন এরিয়া ম্যানেজারের সবাই ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। পাকিস্তান এয়ারলাইন্সের ১০৩ জন বিমানবালার মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন বাঙালি।

প্রতিরক্ষা বা সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে: প্রতিরক্ষা ব্যয়ের ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান চরম বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। ১৯৪৭-৪৮ সাল থেকে ১৯৬৭-৬৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক খাতে ব্যয় হয় সর্বমোট ২,৪৪৪ কোটি টাকা। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে পড়েছিল মাত্র ২৪৪ কোটি টাকা। ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৬৮-৬৯ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় হয়েছিল ২১১৭ কোটি টাকা। এ ২১১৭.৮১ কোটি প্রতিরক্ষা ব্যয়ের মধ্যে কেবলমাত্র ১০% পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছিল। ৭০ পাকিস্তানের এ বিরাট প্রতিরক্ষা বাজেট পূর্ব পাকিস্তান থেকে কর আদায়ের মাধ্যমে সংকুলান করা হতো। কিন্তু তার ৯০% অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হতো। এভাবে বাজেট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতি বছর পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের এক বৃহত্তর অংশ পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হতো এবং সেখানে ব্যয় করা হতো। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বৈষম্য শুধু সৈনিক ও অফিসার নিয়োগের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য যথাযথ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তান কখনো সুদৃষ্টি দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সবসময় অরক্ষিত থাকতো। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত সম্পূর্ণরূপে অরক্ষিত ছিল। যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি বাঙালিদের ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে। অথচ ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় বাঙালি সৈনিকরা পশ্চিম পাকিস্তানের মাটিতে বীরত্বের সাথে ভারতীয় আক্রমণ মোকাবেলা করে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর প্রথমে করাচিতে রাজধানী স্থাপন দ্বিতীয় দফায় তা রাওয়ালপিন্ডিতে এবং সর্বশেষে ইসলামাবাদে স্থায়ীভাবে পাকিস্তানের রাজধানী স্থাপন করা হয়। এ তিনটি রাজধানী শহরের জৌলুষ ও চাকচিক্য বাড়াতে গিয়ে যে বিপুল অর্থ ব্যয় হয় তার সিংহ ভাগেরই যোগানদাতা ছিল পূর্ববাংলা। সামরিক বাহিনীর তিনটি শাখারই (সেনা, নৌ ও বিমান) হেডকোয়ার্টার স্থাপিত হয় পশ্চিম পাকিস্তানে এবং এ অর্থের বড় যোগানদাতা ছিল পূর্ববাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৪৭ সাল থেকেই শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিসহ সব বড় শহরগুলোতে। এগুলো দ্রুত শিল্পশহর হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারত থেকে চলে আসা বড় বড় পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা করাচিসহ পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। পূর্ববাংলা বা পূর্বপাকিস্তান হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প কলকারখানার কাঁচামালের যোগানদাতা।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুতে জাতীয় আয়ের প্রায় ৫২% ই ছিল পূর্ববঙ্গের অবদান। ১৯৪৯-৫০ সালে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্যের মাত্রা ছিল ১৯%। কিন্তু ১৯৫৯-৬০ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩২% এবং ১৯৬৫-৬৬ সালে তা আরো বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৫৫%-এ। ১৯৬৪-৬৫ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয়-বৈষম্য ছিল মাত্র ৪৬%। ১৯৪৭-৬৬ সালের মধ্যে যে বৈদেশিক সাহায্য দেশের উন্নয়নে ব্যয় হয় তার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ ছিল মাত্র ৩৪%। ব্যাংক, বিমা, শিল্প কলকারখানার মালিকানা এককভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে চলে যায়। পূর্ব পাকিস্তান হয়ে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের কাঁচামালের যোগানদাতা-একটি উপনিবেশ।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতে পাকিস্তানের মোট আয় ও অঞ্চলভেদে ব্যয়ের হিসাব^{৭২}

খাত/দিক	সময়কাল	মোট আয় (কোটি টাকায়)	মোট ব্যয় (কোটি টাকায়)	পূর্ব পাকিস্তান (কোটি টাকায়)	পশ্চিম পাকিস্তান (কোটি টাকায়)
বৈদেশিক মুদ্রা আয়	১৯৪৭-৬৭ সাল	৩৯৯৯	-	২২৪০	১৭৫৯
শাসন খাতে ব্যয়	১৯৪৭-৬১ সাল	-	২২১৬	২৬৯	১৯৪৭
উন্নয়ন খাতে ব্যয়	১৯৫০-৭০ সাল	-	৭৫০৯	২১১৪	৫৩৯৫
সামরিক খাতে ব্যয়	১৯৪৭-৬৯ সাল	-	২৪২৪	২৪৪	২২০০
মাথাপিছু ব্যয়	১৯৪৭-৫৫ সাল	-	২৩৮	৩৭	২০১
বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণ	১৯৪৭-৬০ সাল	-	৫৪২.১৫	৯৩.৮৯	৪৪৮.২৫
সামরিক ও বেসামরিক খাতে মোট ব্যয়	-	-	৩১৫৯	৪২৪	৩১৫৯

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তানের উন্নয়ন, আমদানি, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ইত্যাদি খাতের প্রায় সব ক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। জীবনযাত্রার মান, শিল্পায়ন, উন্নয়ন ব্যয়, আমদানি খাতে ব্যয়, রাজস্ব আয় ও ব্যয়, বৈদেশিক সাহায্য ও ঋণবণ্টন প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বড় ধরনের আর্থিক বৈষম্য চোখে পড়ে। এগুলো সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. জীবনযাত্রার মানের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য : ১৯৪৯-৫০ অর্থবছরে পূর্ব পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় যেখানে ছিল ২৮৮ টাকা তখন পশ্চিম পাকিস্তানে ছিল ৩৫১ টাকা। পরবর্তীতে এ বৈষম্যের হার আরো বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯-৭০ অর্থবছরে পশ্চিম পাকিস্তানের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩৩ টাকা হলেও পূর্ব পাকিস্তানে তা ছিল তখন ৩২১ টাকা। পাকিস্তানের উভয় অংশে মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ২০২ টাকা এবং বৈষম্যের অনুপাত দাঁড়ায় ৬১.০%। অথচ ১৯৪৯-৫০ সালে এ মাথাপিছু আয়ের ব্যবধান ছিল মাত্র ২১.৯%। নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে এ বৈষম্য তুলে ধরা হলো:

মাথাপিছু আয় ^{১০}						
	মোট আয়		পার্থক্য	মাথাপিছু আয়		
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান		পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান	বৈষম্য
১৯৪৯-৫০ GNP	১২৩৬০	১২১০৬	+২৫৪	২৮৭	৩৩৮	১৮%
১৯৫৯-৬০ GDP	১৪৪৮৯	১৭২৫৩	-২৭৬৪	২৭৮	৩৬৬	৩১%
১৯৬৭-৬৮	২০২৩৫	২৮৬৫২	-৮৪১৭	৩০২	৫৩০	৭৫%

অর্থনৈতিক বৈষম্য

নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাজার দর (১৯৫৯-৬০) ^{৭৪}		
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর নাম	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
প্রতি মণ চাল	৩৫.০০ টাকা	২০.০০-২৫.০০ টাকা
প্রতি মণ আটা	২৫.০০-৩০.০০ টাকা	১৫.০০-২০.০০ টাকা
প্রতি সের সরিষার তেল	৫.০০ টাকা	২.৫০ টাকা

অর্থনৈতিক বৈষম্য

২. শিল্পায়নে বৈষম্য: পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে পূর্ব-বাংলা ছিল কলকাতার শিল্প কলকারখানার কাঁচামালের যোগানদাতা। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট, চা, তুলা, রেশম, চামড়া, চিনি, তামাক প্রভৃতি থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। পূর্ব বাংলার বাঁশ ও কাঠ পাকিস্তানের কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট শিল্পে কাঁচামালের যোগান দিতো। ১৯৪৮-৪৯ অর্থবছরে পাকিস্তানের জাতীয় আয়ের ৫৭.৫৯ ভাগই অর্জিত হতো পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী রপ্তানি করে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা থেকে। নিম্নের ছকটি বিশ্লেষণ করলেই ১৯৪৫ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির সময় পাকিস্তান উভয় প্রদেশে শিল্প-কলকারখানার সংখ্যাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প কারখানা ^{৭৫}				
শিল্প	অবিভক্ত ভারতে সংখ্যা	পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত	পূর্ব পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত	পশ্চিম পাকিস্তানের অংশে প্রাপ্ত
পাটকল	১১৪	—	—	—
তুলাকল	৪০৫	১৪	১০	৪
চিনিকল	১৫১	৯	৫	৪
সিমেন্ট কারখানা	১৩	৫	১	৪
ম্যাচ ফ্যাক্টরি		৮	৪	৪
মোট		৩৮	২০	১৬

অর্থনৈতিক বৈষম্য

৩. উন্নয়ন ব্যয় বৈষম্য : ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর তিনবার পাকিস্তানের রাজধানী স্থানান্তর করতে গিয়ে এবং সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর হেডকোয়ার্টার, ব্যাংকিং ও ঋণদান প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করার ফলে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হয়। ৭৬ এর সুফল পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ একচেটিয়াভাবে ভোগ করে। অথচ এজন্য যে ব্যয় হয় তার সিংহ ভাগ অর্থের যোগানদাতা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ। ১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তানের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যে অর্থ ব্যয় করা হয় তার প্রায় ৯০% ব্যয় করা হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। এ সময়কালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে রাজস্ব আয় ১৬৮১ মিলিয়ন টাকা হলেও এখানে ব্যয় করা হয় মাত্র ৪২৭ মিলিয়ন টাকা। পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে ব্যয়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট বৈষম্য নিম্নে ছকের সাহায্যে দেখানো হলো:

১৯৪৭-৫৫ সময়কালে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেশভিত্তিক ব্যয়ের পরিমাণ ^{৭৭}			
ব্যয়ের খাত	পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় (মিলিয়ন) টাকা	পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয়ের শতকরা হার
আর্থিক সাহায্য	১০,০০০	১,২৬০	১১.২
মূলধন ব্যয়	২,১০০	৬২০	২২.৮
অনুদান	৫৪০	১৮০	২৫.০
শিক্ষাখাত	১,৫৩০	২৪০	১৩.৩
বৈদেশিক সাহায্য বরাদ্দ	৭৩০	১৫০	১৭.০
প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়	৪,৬৫০	১০০	২.১
মোট	১৯,৫৫০	২,৫৫০	১০.২

অর্থনৈতিক বৈষম্য

৪. আমদানি খাতে ব্যয় বরাদ্দে বৈষম্য: ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর ক্ষমতাসীন সরকার আমদানি খাতে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করলেও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য সেভাবে অর্থ বরাদ্দ করেনি। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানা স্থাপন ও শিল্পসামগ্রী উৎপাদনে পিছিয়ে পড়ে। ১৯৪৭-৫৮ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে আমদানি খাতে যে ব্যয় বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তা নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে দেখানো হলো:

আমদানি খাতে ব্যয় বরাদ্দে বৈষম্য		
অর্থবছর	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান
১৯৪৭-৪৮	৪০ মিলিয়ন টাকা	৩১৮ মিলিয়ন টাকা
১৯৪৮-৪৯	২৮২ " "	১১৭৭ " "
১৯৪৯-৫০	৩৮৫ " "	৯১২ " "
১৯৫০-৫১	৪৫৩ " "	১১৬ " "
১৯৫১-৫২	৭৬৩ " "	১৪৭৪ " "
১৯৫২-৫৩	৩৬৬ " "	১০১৭ " "
১৯৫৩-৫৪	২৯৪ " "	৮২৪ " "
১৯৫৪-৫৫	৩২০ " "	৭৮৩ " "
১৯৫৫-৫৬	৩৬১ " "	৯৬৪ " "
১৯৫৬-৫৭	৮১৮ " "	১৫১৬ " "
১৯৫৭-৫৮	৭৩৫ " "	১৩১৪ " "

অর্থনৈতিক বৈষম্য

৫. রাজস্ব আয় ও ব্যয়ে বৈষম্য: পাকিস্তানের রাজস্ব ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতো পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তান। নিম্নের ছকটি বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তানের মোট রাজস্ব ব্যয় এবং এতে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অংশ লক্ষ্য করলে ব্যাপারটি সহজেই ধরা পড়ে:

১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের রাজস্ব ব্যয় ^{৭৯}					
বছর	মোট ব্যয় (মিলিয়ন রুপী)	পশ্চিম পাকিস্তান	শতকরা হার	পূর্ব পাকিস্তান	শতকরা হার
১৯৫০-৫৫	৮৯১০	৭২০০	৮০.৮১	১৭১০	১৯.১৯
১৯৫৫-৬০	১১৫২০	৮৯৮০	৭৭.৯৫	২৫৪০	২২.০৫
১৯৬০-৬৫	১৭১৮০	১২৮৪০	৭৪.৭৪	৪৩৪০	২৫.২৬
১৯৬৫-৭০	২৮৭১০	২২২৩০	৭৭.৪৩	৬৪৮০	২২.৫৭
মোট	৬৬৩২০	৫১২৫০	৭৭.২৮	১৫০৭০	২২.৭২

অর্থনৈতিক বৈষম্য

৬. আন্তঃবাণিজ্য বৈষম্য: পাকিস্তানের উভয় প্রদেশে অর্থনৈতিক শোষণের অন্য একটি ক্ষেত্র ছিল দেশের দুই অঞ্চলের বাণিজ্যে বৈষম্য। ১৯৪৭-৬৯ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে রপ্তানি হয়েছে ৮,২৩৮ মিলিয়ন টাকার (১,৭৩৭ মিলিয়ন ডলার) পণ্য। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আমদানি করেছে ১৫,৭৩৯ মিলিয়ন টাকার (৩,৩০৯ মিলিয়ন ডলার) পণ্য। এমনভাবে দু অঞ্চলে বাণিজ্যের নামে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল মুনাফা অর্জন ও অর্থ পাচার করে।

৭. কৃষি উন্নয়নে বৈষম্য : ১৯৪৭ সালে পূর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা অধিক কৃষিপণ্য উৎপাদনকারী প্রদেশ। পূর্ব বাংলার পাট, চা, তামাক রপ্তানি করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। অথচ সুজলা-সুফলা পূর্ব পাকিস্তানের কৃষির উন্নয়নের ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের দারুণ অবহেলা ছিল। কৃষির উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক যে ৬০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছিল এর সিংহভাগ পেয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানিরা। সেচ প্রকল্পের নামে পশ্চিম পাকিস্তানে কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের কৃষি ভূমিকে সর্বনাশা বন্যার কবল থেকে রক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপই নেয়া হয়নি।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

৮. অবকাঠামোগত বৈষম্য: উন্নয়ন প্রকল্পে পশ্চিমাঞ্চলকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়ায় পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে আকাশ-পাতাল বৈষম্য বা ব্যবধান সৃষ্টি হয়। বারবার রাজধানী স্থানান্তর ও নতুন করে গড়ে তোলা ব্যাংক, বিমা, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানের হেড অফিস, সামরিক, বিমান, নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, বিদেশি মিশনের প্রধান কার্যালয় প্রভৃতি পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন করার ফলে প্রকৌশল উন্নয়ন কার্যক্রম মূলত সেখানেই হয়। অবকাঠামোগত এ বৈষম্য ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাবার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এ বৈষম্যের অবসান চেয়েছিল। এজন্য তারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত ৬ দফাকে সমর্থন জানায়।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

১৯৪৮-৫৫ সময়কালে শিক্ষাখাতে পশ্চিম পাকিস্তানকে যেখানে বরাদ্দ দেয়া হয় ১,৫৩০ কোটি টাকা, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানকে দেয়া হয় মাত্র ২৪০ কোটি টাকা (১৩.৫%)। ৮৬ অপর আরেক তথ্য অনুযায়ী ১৯৫১-১৯৬১ সালে শিক্ষাখাতে পূর্ব পাকিস্তানিদের জন্য মাথাপিছু বার্ষিক বরাদ্দ ছিল ৫.৬৩ টাকা অথচ পশ্চিম পাকিস্তানিদের জন্য তা ৮.৬৩ টাকা অর্থাৎ ব্যবধান ৫৩% এরও বেশি। Colombo Plan, Ford Foundation, Commonwealth Aid-প্রভৃতি প্রোগ্রামের আওতায় যে সকল বৈদেশিক বৃত্তি দেয়া হয় তার সুযোগ সুবিধা পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভোগ করে। পূর্ব পাকিস্তানের যোগ্য প্রার্থীরা অনেক সময় এসব বৃত্তির সন্ধানই পেতো না। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ৩৫টি বৃত্তির মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি ছাত্ররা পেয়েছিল ৩০টি এবং পূর্ব পাকিস্তানি ছাত্ররা পেয়েছিল ৫টি। ১৯৫৪-১৯৬৪ সময়কালে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে মোট ব্যয়ের ২০% অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানকে এজন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল ৮০%। পাকিস্তানে মোট ১৬টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টি ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পূর্ব পাকিস্তানে ছিল মাত্র ৩টি।

সামাজিক বৈষম্য

১৯৪৭ সালের পর থেকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও পরিকল্পনাগত বৈষম্যের কারণে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের সমাজ জীবনে তার প্রভাব পড়ে। এজন্য কৌশলে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য সৃষ্টি করা হতো এবং তা বাঙালিদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে রাখার চেষ্টা করা হতো। এজন্যই পশ্চিম পাকিস্তানে যখন চালের দাম ছিল ১৮ টাকা মণ, পূর্ব পাকিস্তানে তখন তা ছিল ৫০ টাকা। গম যখন ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে ১০ টাকা মণ তখন পূর্ব পাকিস্তানে ছিল ৩৫ টাকা মণ। রাস্তা-ঘাট, স্কুল, কলেজ, অফিস আদালত, হাসপাতাল, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিরা বেশি সুবিধা ভোগ করতো। যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই লক্ষ করা যায় যে, বাঙালিদের থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানিদের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানিদের মাথাপিছু আয় থেকে জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই উন্নতি ও অগ্রগতি দৃশ্যমান হয়ে উঠতে।

সামাজিক বৈষম্য

সমাজকল্যাণ ক্ষেত্রে বৈষম্য^{৮৭}

ধেণি	পশ্চিম পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তান
১। জনসংখ্যা	৫ কোটি ৫০ লক্ষ	৭ কোটি ৫০ লক্ষ
২। ডাক্তার সংখ্যা	১২,৪০০	৭,৬০০
৩। হাসপাতালের বেড সংখ্যা	২৬,০০০	৬,০০০
৪। পল্লী স্বাস্থ্যকেন্দ্র	৩২৫	৮৮
৫। শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র	৮১	৫২

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২৫ ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি বা দাবি

টপিক ২৫: ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি বা দাবি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ক. ৬ দফার পটভূমি: 'পাকিস্তান' রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়েছিল লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি বরং ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানিদের শোষণ-বঞ্চনা ও নির্যাতন। ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলে বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তান ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য কাঁচামালের যোগানদাতা একটি কলোনি বা উপনিবেশে পরিণত হয়। যে গুটিকয়েক শিল্প-কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মালিকও ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতিগণ। এসব শিল্প-কারখানা থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বা পুঁজি তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করতেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধ দেখা দিলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। সামরিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানের এ অসহায় অবস্থা ও অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধী দলগুলোর সম্মেলনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক 'ছয় দফা কর্মসূচি' পেশ করেন। এরপর তিনি তা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে জনমত সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হন। এ কর্মসূচিকে তিনি 'পূর্ব পাকিস্তানের বাঁচার দাবি' বলে অভিহিত করেন। ছয় দফা কর্মসূচি দ্রুত বাঙালি জনগণ কর্তৃক সমাদৃত হয়।

খ. ছয় দফা কর্মসূচি: ছয় দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১. ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করতে হবে। পাকিস্তানে সত্যিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সকল প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলো গঠিত হবে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনসংখ্যানুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।
২. যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের হাতে থাকবে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে প্রদেশ বা অঙ্গ রাজ্যগুলোর পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে।
৩. দেশের দু অঞ্চলের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে অথবা দেশের দু অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। তবে এক্ষেত্রে সংবিধানে এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যাতে এক অঞ্চলের মুদ্রা ও মূলধন অন্য অঞ্চলে পাচার হতে না পারে।

৪. সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা ও কর ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকবে। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকার পাবে।

৫. বৈদেশিক মুদ্রার ওপর প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলোর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সম্পর্কে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলো আলাপ-আলোচনা ও চুক্তি করতে পারবে।

৬. আঞ্চলিক সংহতি ও জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার কার্যকর ব্যবস্থা হিসেবে প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যগুলো 'আধা-সামরিক বাহিনী' বা 'মিলিশিয়া' রাখতে পারবে।

গ. ছয় দফা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (Six Point and Bengali Nationalist Movement): ছয় দফা দাবি কি পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার জন্য হুমকিস্বরূপ ছিল? পাকিস্তানে যখনই সুস্থ গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতি প্রবর্তন, স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন এবং মাতৃভাষার স্বীকৃতি চাওয়া হয়েছে, তখনই শাসকগোষ্ঠী এর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। গণতন্ত্রকামী ও স্বায়ত্তশাসনকামী নেতাদেরকে 'ভারতের দালাল', 'সোভিয়েত রাশিয়ার দালাল', 'কমিউনিস্ট', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', 'পাকিস্তানের শত্রু', 'ইসলামের শত্রু' বলে সমালোচনা করা হয়েছে। ছয় দফা প্রকাশিত হলে আইয়ুব সরকার ছয় দফাকে 'রাষ্ট্রবিরোধী' এবং 'বিচ্ছিন্নতার দাবি' এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে 'পাকিস্তানের শত্রু' ও 'ভারতের দালাল' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বাঙালি জনগণ এসব কথায় বিভ্রান্ত হয়নি।

ছয় দফা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এর মূল উদ্দেশ্য ছিল পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা। অগণতান্ত্রিক শাসন যেন আর প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সেজন্য প্রথম দফাতে বলা হয়েছিল, "লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক সংসদীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে।" অর্থনৈতিক শোষণ ও মুদ্রা পাচার রোধের জন্য তৃতীয় দফায় দুটি মুদ্রার কথা কিংবা একই মুদ্রাসহ কার্যকর সাংবিধানিক বিধিনিষেধ আরোপের কথা বলা হয়েছিল। ৪র্থ দফায় পাকিস্তানের সকল প্রদেশকে বাণিজ্যিক অধিকার প্রদানের দাবি করা হয়েছিল। ষষ্ঠ দাবি ছিল আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের। এ দাবি উত্থাপন করার প্রয়োজন দেখা দিত না যদি পাকিস্তান সরকার সামরিক ক্ষেত্রে বাঙালিদেরকে অরক্ষিত এবং চরম অসহায় পর্যায়ে ঠেলে না দিত। পাকিস্তানের তিন বাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কিন্তু বাঙালিরা কোনোদিন এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। অথচ শুধুমাত্র নৌ-বাহিনীর সদর দপ্তর এবং 'মিলিশিয়া' গঠনের দাবি প্রকাশ করার সাথে সাথেই বাঙালির প্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘোষণা করা হয় 'বিশ্বাসঘাতক' বলে। ছয় দফা কর্মসূচিতে পাকিস্তানকে সরাসরি ভাঙতে চাওয়া না হলেও এর মধ্যেই বাঙালির জাতীয় মুক্তি নিহিত ছিল।

ছয় দফা কর্মসূচি বা দাবি পূর্ব বাংলার অবহেলিত ও স্বাধিকারকামী মানুষের নিকট দ্রুত সমাদৃত হয়। ছয় দফার সমর্থনে ক্রমশ একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার ছয় দফা আন্দোলনকে 'রাষ্ট্রবিরোধী আন্দোলন' বলে অভিহিত করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে 'আপত্তিকর' বক্তব্য প্রদানের জন্য বিভিন্ন জেলার আদালতে আনীত মিথ্যা ফৌজদারি মামলায় আটক করা হতে থাকে। কিন্তু প্রতিটি মামলায় শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতাগণ মুক্তি লাভ করেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে আইয়ুব সরকার আওয়ামী লীগ নেতাদের ওপর বিশেষ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ওপর আরো নিত্য-নতুন মামলা রুজু করে তাঁকে কারাগারে অন্তরীণ রাখতে বদ্ধপরিকর হন।

৮ মে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরূপ অন্যায়ভাবে হয়রানির বিরুদ্ধে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ছয় দফার সপক্ষে সভা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। এ আন্দোলনে প্রায় এক হাজার আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার হন। এদিন পুলিশের গুলিতে ১২ জন নিহত এবং শত শত লোক আহত হয়। ১৬ জুন আইয়ুব সরকার 'ইত্তেফাক' পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং এর সম্পাদক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-কে গ্রেপ্তার করেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সরকার এ আন্দোলন দমন করতে ব্যর্থ হয়। এ আন্দোলনের ফলে 'ছয় দফা' জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বায়ত্তশাসনকামী বাঙালি জনগণের নিকট নির্ভীক ও আপসহীন নেতায় পরিণত হন।

ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব বা তাৎপর্য

ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব নিম্নরূপ :

১. বাঙালির বাঁচার দাবি: ছয় দফা কর্মসূচি ছিল বাঙালির বাঁচার দাবি। পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের ওপর শোষণ ও নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়েই চলছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়েই চলছিল। সামরিক দিক থেকে বাঙালিদেরকে অরক্ষিত ও অসহায় করে রাখা হয়েছিল। সমগ্র বাঙালি জাতির এ যুগসন্ধিক্ষণে আপসহীন নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এগিয়ে আসেন ছয় দফা কর্মসূচি নিয়ে বাঙালি জাতিকে বাঁচাতে।
২. বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বিকশিত করা: ভাষা আন্দোলনের চেতনায় সমৃদ্ধ বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূলে সেদিন বারি সিঞ্জন করেছিল ছয় দফা কর্মসূচি। ছয় দফা কর্মসূচি বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনাকে একটি আন্দোলনে রূপদান করে। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার ফসলই আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ।

ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব বা তাৎপর্য

৩. সংগ্রামের শক্তি: ছয় দফা কর্মসূচি নিরাশার অন্ধকারে নিষ্ক্ষিপ্ত বাঙালি জাতিকে সংগ্রামের শক্তি যুগিয়েছিল। প্রেরণা যুগিয়েছিল স্বৈরাচারী ও গণবিরোধী শাসকের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে। সরকার এ আন্দোলন দমনে যতই নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিল, আন্দোলন ততই দ্রুত দানা বাঁধতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদও ততই সংহত রূপ লাভ করতে থাকে। ছয় দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলন সর্বপ্রথম এদেশে গণমুখী আন্দোলন গড়ে তোলে।

৪. বাঙালির ম্যাগনাকার্টা: বাঙালি জনগণ ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সরকারের সাথে আপসহীন লড়াই চালানোর শিক্ষা গ্রহণ করে। বাঙালি জনগণ ছয় দফাভিত্তিক স্বাধিকার আন্দোলনের সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে ১৯৬৯ সালে ব্যাপক গণ-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে জয়যুক্ত হয়।

উপসংহার: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অগ্রগতির ইতিহাস তথা স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ৬ দফা কর্মসূচির ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। ৬ দফা এদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি মাইলফলক। ৬ দফা ছিল একটি সুচিন্তিত কর্মসূচি। এটি ছিল বাঙালির মুক্তি সনদ, বাঙালির ম্যাগনাকার্টা।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২৬ আগরতলা মামলা এবং বাঙালির বিক্ষোভ

টপিক ২৬: আগরতলা মামলা এবং বাঙালির বিক্ষোভ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকার ১৯৬৭ সালের ১৬ জুন নির্ভীক সাংবাদিক তোফাজ্জল হোসেন (মানিক মিয়া)-কে গ্রেপ্তার, তাঁর 'নিউ নেশান প্রিন্টিং প্রেস' বাজেয়াপ্ত, 'ইত্তেফাক' প্রকাশনা বন্ধ ঘোষণা এবং আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দকে পাইকারিভাবে গ্রেপ্তার করতে থাকে। ১৯৬৭ সালের ২৩ জুন তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন জাতীয় পরিষদে ঘোষণা করেন যে, “রবীন্দ্র সংগীত পাকিস্তানি সংস্কৃতির পরিপন্থী, সুতরাং বেতার ও টেলিভিশনে তা প্রচার করা যাবে না।” বাঙালি সংস্কৃতি বিরোধী এ সিদ্ধান্ত ঘোষণার সাথে সাথে প্রতিবাদের ঝড় এবং আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। আইয়ুব-মোনায়েম বিরোধী আন্দোলন যখন তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে তখন সরকার গোপনে ষড়যন্ত্র করতে থাকে কীভাবে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে চিরতরে ধ্বংস করে দেওয়া যায়।

ছয় দফা আন্দোলনের জন্য 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার' অভিযোগে অভিযুক্ত ও দেশরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ১৯৬৮ সালের ১৭ জানুয়ারি বেকসুর খালাস প্রদান করা হয়। কিন্তু ১৮ জানুয়ারি জেল গেটের বাইরে পা রাখার সাথে সাথেই তাঁকে 'পাকিস্তান আর্মি, নেভী এবং এয়ারফোর্স এ্যাক্ট'-এ গ্রেপ্তার করে কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কুর্মিটোলা সেনানিবাসে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তারের পর সরকারি প্রেসনোটে বলা হয় যে, “শেখ মুজিবসহ গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে আসছিলো এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিলো। শেখ মুজিবুর রহমান ও তার সহযোগীরা ভারতের আগরতলায় গোপন বৈঠকে বসে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্র করছিলো।” শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে মোট ৩৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'আগরতলা মামলা' তৈরি করা হয়। ১৯৬৮ সালের ২১ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি জনাব এম. এ. রহমানের নেতৃত্বে একটি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। সংশ্লিষ্ট আইন মোতাবেক (অর্ডিন্যান্স নং ৫-১৯৬৮) এ ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কোনো সুযোগ ছিল না। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন কুর্মিটোলা সেনানিবাসে কড়া প্রহরায় 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব ও অন্যদের মামলা' শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী প্রমাণ করে ফাঁসি দেওয়াই ছিল এ মামলার লক্ষ্য।

কিন্তু কুর্মিটোলা সেনানিবাসের অভ্যন্তরে যখন আইয়ুব-মোনায়েমের এ পাতানো, ষড়যন্ত্রমূলক ও প্রহসনমূলক মামলা চলতে থাকে, বাইরে তখন গোটা দেশে আগুনের ফুলকি হয়ে জ্বলতে থাকে মানুষের বিক্ষোভ। মিছিলে মিছিলে প্রকম্পিত হতে থাকে রাজপথ। ছাত্রদের বুকফাটা শ্লোগানে প্রতিবাদের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়ে পৌঁছে যেতে থাকে গ্রামে-গঞ্জে। ১৪৪ ধারা, গুলি, নির্যাতন, থ্রেপ্তার সবকিছু উপেক্ষা করে বাঙালি জনগণ খুলে ফেলতে উদ্যত হয় ধোঁকাবাজ, ষড়যন্ত্রকারী ও লুটেরা শাসকদের মুখোশ। প্রহসনমূলক ও সাজানো এ "আগরতলা মামলা" বাঙালি জনগণকে আরো ঐক্যবদ্ধ করে তোলে। অতি দ্রুত শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা এবং আওয়ামী লীগ সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হয়। স্বাধিকার আন্দোলন আরো দুর্বীর হয়ে ওঠে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২৭ ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

টপিক ২৭: ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ক. গণঅভ্যুত্থানের কারণ: নিম্নলিখিত কারণে ১৯৬৯ সালে গণআন্দোলন শুরু হয় :

১. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য: গণআন্দোলনের মূল কারণ ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সৃষ্ট বৈষম্য। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাঙালি জনগণকে বঞ্চিত করা হয়। ফলে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে।
২. মৌলিক গণতন্ত্রের অভিশাপ: আইয়ুব খান সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে সমগ্র পাকিস্তানে ৮০,০০০ (আশি হাজার) মৌলিক গণতন্ত্রীর হাতে ভোটাধিকার অর্পণ করেন। এ আশি হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি থেকে আইন পরিষদের সদস্যদেরকে নির্বাচন করতেন। এছাড়াও তাদের হাতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলো (ইউনিয়ন কাউন্সিল, পৌরসভা) পরিচালনার ক্ষমতাও প্রদান করা হয়। এসব মৌলিক গণতন্ত্রীদের দাপট ছিল অসামান্য। তারা অন্ধভাবে আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের দালালি করতেন। তাদের গণবিরোধী কার্যকলাপ জনগণকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।
৩. আমলা-সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি: আইয়ুব-মোনায়েম শাসনামলে পাকিস্তানের রাজনীতি ও প্রশাসনে আমলা-সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। আমলা ও সেনা কর্মকর্তাগণ নগ্নভাবে রাজনীতি ও প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে হস্তক্ষেপ করতেন। সচেতন জনগণ এর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

৪. স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি উপেক্ষা: পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল 'লাহোর প্রস্তাবের' ভিত্তিতে। লাহোর প্রস্তাবের অন্যতম মূল দাবি ছিল 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকচক্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে 'শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন' প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানসহ সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনকামী জনগণও ১৯৬৯ সালে আইয়ুব সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

৫. সরকারি দমননীতি ও পুলিশি নির্যাতন: সমগ্র পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী জনগণ যখন গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সোচ্চার হতে থাকে, পাকিস্তানি সরকার তখন তা দমনের জন্য নৃশংস পুলিশি নির্যাতন চালাতে থাকে। নির্যাতন যতই বাড়তে থাকে জনগণও ততই আন্দোলনমুখী হতে থাকে।

৬. জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনার প্রসার: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সৃষ্ট জাতীয়তাবাদী চেতনা, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয় এবং ১৯৬৬ সালে ছয় দফা কর্মসূচি প্রকাশের পর আরো গতিশীল হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে।

৭. দুর্নীতির প্রসার: আইয়ুব খানের শাসনামলে পাকিস্তানে দুর্নীতির প্রসার ঘটে। আমলা, সেনাবাহিনী ও মৌলিক গণতন্ত্রীদেব দ্বারা এ দুর্নীতির বিস্তার ঘটে। জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন এ দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।

৮. ৬ দফা আন্দোলনের প্রভাব: ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে অতি দ্রুত তা বাঙালির বাঁচার দাবি, মুক্তি সনদ হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়। বাঙালি জনগণ স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এরই বহিঃপ্রকাশ ১৯৬৯ এর গণআন্দোলন।

৯. আগরতলা মামলার প্রভাব: বাঙালি জনগণের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন যখন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দানা বেঁধে উঠতে থাকে তখন আইয়ুব-মোনায়েম খান শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এ আন্দোলন নস্যাত্ন করার এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসিতে ঝুলানোর জন্যই "আগরতলা মামলা" দায়ের করা হয়। এর বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে। ছাত্রসমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ আইয়ুব-মোনায়েম খানের পতনের আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে শুরু করলে গণআন্দোলন দূর্বীর গতি লাভ করে।

১০. ১১ দফা আন্দোলন: আইয়ুব-মোনায়েম খানের অগণতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি 'এগার দফা কর্মসূচি' ঘোষণা করলে জনগণের বিক্ষোভ গণবিক্ষোভে রূপান্তরিত হয়। বিক্ষোভ দমনে সরকার যতই গুলি বর্ষণ ও নির্যাতন বৃদ্ধি করতে থাকে ততই আন্দোলনরত জনগণ মারমুখী হয়ে উঠতে থাকে। ১১ দফা আন্দোলনের কারণেই ১৯৬৯ সালের আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়।

খ. গণঅভ্যুত্থানের গতিপ্রবাহ: স্বৈরাচারী আইয়ুব-মোনায়েম সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৬৮ সালের ৩ জানুয়ারি পল্টনের জনসভায় মাওলানা ভাসানী গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতা প্রদান করেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য, হত্যা, জেল-জুলুম, হয়রানি এবং সর্বশেষে 'আগরতলা মামলার' কারণে জনতার রুদ্ররোষে সেদিন মাওলানা ভাসানী সংযোগ করেছিলেন তাঁর জ্বালাময়ী বক্তব্যের অগ্নি শলাকা। গোটা ডিসেম্বর মাসে প্রায় সকল রাজনৈতিক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও সাংবাদিকদের সরকার বিরোধী সভা-শোভাযাত্রা চলতে থাকে। ১৯৬৮ সালের ৭ ডিসেম্বর ঢাকা শহরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল পালিত হয়। হরতালে পুলিশের গুলিতে ৪ জন নিহত, ৩০ জন আহত এবং তিন শতাধিক মানুষ গ্রেপ্তার হন। বাঙালি জনগণকে রক্তপাতের মাধ্যমে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন খুনি-রক্তলোলুপ আইয়ুব-মোনায়েম চক্র। কিন্তু তারা জানতেন না যে, রক্তপাত বাঙালির চেতনার শিকড়। পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে ১৩ ডিসেম্বর হরতাল পালিত হয়, শুরু হয় জনতার 'ঘেরাও আন্দোলন'। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ 'এগার দফা কর্মসূচি' ঘোষণা করলে আন্দোলনের গতি তীব্রতর হতে থাকে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দুর্বীর আন্দোলনের মুখে আইয়ুব-মোনায়েমের সাধের 'উন্নয়ন দশকের' উৎসবের জৌলুষ হারিয়ে যায়। সকল অন্যায়, কুকর্ম, খুন ও অপহরণের জন্য মোনায়েম খানের সৃষ্ট 'এন. এস. এফ.' নামক ছাত্র সংগঠনটি বাংলার মাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যায়।

২০ জানুয়ারি ছিল উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের মাইলস্টোন। ১৮ তারিখের পুলিশ, ই. পি. আর বাহিনী কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং এগার দফা দাবিতে এদিন ঢাকাসহ প্রদেশের সর্বত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পূর্ণ ধর্মঘট পালিত হয়। ঐদিন পুলিশের গুলিতে অন্যতম ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান নিহত হলে আন্দোলনের চরিত্র ও গতি দ্রুত বদলে যায়। 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' ২১ জানুয়ারি হরতাল, ২২ জানুয়ারি শোক মিছিল এবং ২৩ জানুয়ারি মশাল মিছিল বের করে। কালো পতাকা এবং মিছিলের অগ্রভাগে শহীদ আসাদের রক্তমাখা শার্টসহ শোক মিছিল নগ্নপদে শহরে বের হলে মিছিলে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। সুরণকালে এত বড় গণ-মিছিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়নি। রাস্তার পাশের ঘর-বাড়ির ছাদ ও জানালা থেকে মিছিলকারীদের ওপর পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকে। এদিনও সরকারি নির্দেশে গুলি বর্ষণে ৬ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হন। এর ফলে ছাত্রসমাজ ২৪ জানুয়ারি আবারো 'হরতাল' ডাকেন। ২৪ তারিখে শহরে এবং গোটা দেশব্যাপী মানুষের ঢল প্লাবিত করে ফেলে রাজপথ। গণ-জাগরণের উত্তুঙ্গ জোয়ার সৃষ্টি হয়। এ দিনগুলোতে রুস্তম, দশম শ্রেণির ছাত্র মতিউর এবং খুলনায় তিনজন নিহত হয়। এরপর আন্দোলন চলতে থাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। আন্দোলন দমনের জন্য সেনাবাহিনী তলব করা হয়। সমগ্র পাকিস্তানে গণআন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। রক্তলোলুপ আইয়ুব খান এবারে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন জনতার কাছে।

১৯৬৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি তিনি বিরোধী দলগুলোর সাথে আলাপ-আলোচনার প্রস্তাব রাখেন এবং ৮ ফেব্রুয়ারি ইত্তেফাক পত্রিকার ওপর থেকে বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ প্রত্যাহার করেন। ৯ ফেব্রুয়ারি বিরোধী দলীয় জাতীয় পরিষদ সদস্যগণ পদত্যাগ করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে ধৃত রাজবন্দীদেরকে বিনাশর্তে মুক্তি প্রদান করা হয়। ১২ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমেদকে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টের অভ্যন্তরে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ফলে ১৬ ফেব্রুয়ারি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে ঢাকা শহর। উন্মত্ত জনতা আগরতলা মামলার বিচারপতি এম. এ. রহমান, রবীন্দ্র সঙ্গীত নিষিদ্ধ ঘোষণাকারী আইয়ুব খানের সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ ও কুখ্যাত সহচর এবং তৎকালীন তথ্য ও বেতার মন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন, প্রাদেশিক যোগাযোগ মন্ত্রী সুলতান আহমদ, প্রাদেশিক পূর্ত মন্ত্রী মং শোয়ে গু চৌধুরী এবং প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি খাজা হাসান আসকারীর বাসভবনে অগ্নিসংযোগ করে। ফলে সরকার ১৬ জানুয়ারি রাতে সারা দেশ থেকে জরুরি আইন প্রত্যাহার করে নেয়। ১৭ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়।

'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান : গণঅভ্যুত্থান দমনে সরকার বেপরোয়া হয়ে উঠে। ১৮ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের (গেইটের) সামনে পাকিস্তানি সেনারা কোনো কারণ ছাড়াই নৃশংসভাবে বেয়নেট চার্জ করে নির্মমভাবে হত্যা করে প্রক্টর অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহাকে। এ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের খবর মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। ঢাকায় সাক্ষ্য আইন উপেক্ষা করে জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। নির্বিচারে গুলি চালায় সেনাবাহিনী। ২১ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান ঘোষণা করেন যে, তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। তিনি গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব এবং শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের জনসভায় মাওলানা ভাসানী দৃপ্তকণ্ঠে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ঘোষণা করেন, “শেখ মুজিবকে নিঃশর্ত মুক্তি দিতে হবে এবং আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে।” বাধ্য হয়ে আইয়ুব-মোনায়েম সরকার ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করে। শেখ মুজিবসহ সকল রাজবন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান করা হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রেসকোর্স ময়দানের সংবর্ধনা সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে “বঙ্গবন্ধু” উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

১০ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ও ১১ দফা উত্থাপন করেন। DAC নেতা নূরুল আমীন, প্রাক্তন বিচারপতি এস. এম. মোর্শেদ ও অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ছয়-দফা প্রশ্নে প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করলেও DAC নেতা হামিদুল হক চৌধুরী, আবদুস সালাম খান, মাহমুদ আলী ও মৌলভী ফরিদ আহমদের মতো বেঙ্গলমান বাঙালি সন্তানদের চক্রান্তে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়, ছয়-দফা প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে গণআন্দোলন আরো তীব্র হলে ২০ মার্চ গভর্নর মোনায়েম খান অপসারিত হন। গভর্নর পদে অধিষ্ঠিত হন ড. এম. এন. হুদা। কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত না হওয়ায় ২৫ মার্চ আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে প্রধান সেনানায়ক জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এভাবে আইয়ুব-মোনায়েম স্বৈরাচারের যবনিকাপাত ঘটে গণআন্দোলনের ফলে।

গ. ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য: ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নরূপ:

১. বাঙালি জাতীয়তাবাদকে সুসংহতকরণ: ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ গণআন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদ সুসংহত হয়ে ওঠে। বাঙালি জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়।
২. স্বৈরাচার বিরোধী মানসিকতার জন্ম এ গণআন্দোলনের ফলে স্বৈরাচারবিরোধী মানসিকতা জনগণের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত হয়। বাকস্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার জন্য জনগণ সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকারের জন্যও মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়।
৩. গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান: আইয়ুব-মোনায়েম সরকার জনগণের নিকট নতি স্বীকার করে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রাওয়ালপিন্ডিতে একটি সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকতে বাধ্য হন। এ গোলটেবিল বৈঠকে তিনটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নেতৃবর্গ ঐকমত্যে পৌঁছেন। সেগুলো হলো- (১) প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, (২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পদ্ধতির প্রবর্তন এবং (৩) সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন।

৪. আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদান: আইয়ুব-মোনায়েম সরকার আগরতলা মামলা প্রত্যাহার এবং সকল রাজবন্দীর মুক্তি প্রদান করতে বাধ্য হন।
৫. বঙ্গবন্ধু মুজিব অবিসংবাদিত নেতা এ আন্দোলনের ফলে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির একমাত্র নন্দিত নেতায় পরিণত হন।
৬. আইয়ুব-মোনায়েম খানের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান: সবশেষে এ আন্দোলনের ফলে আইয়ুব-মোনায়েম খানের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটে। তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিষ্ক্ষিপ্ত হন।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২৮ জেনারেল ইয়াহিয়ার আইনগত কার্তামো আদেশ

টপিক ২৮: **জেনারেল ইয়াহিয়ার আইনগত কার্ণামো আদেশ**

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি আব্দুস সাত্তারকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিযুক্ত করেন এবং এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি 'আইনগত কাঠামো আদেশ' জারির মাধ্যমে নির্বাচিত জনগণের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের ১ মার্চ এক আদেশবলে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানে 'এক ইউনিট' ভেঙে দিয়ে প্রদেশগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করেন। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ তিনি 'আইনগত কাঠামো আদেশ' (Legal frame-work order) জারি করেন। 'আইনগত কাঠামো আদেশের' ২০ অনুচ্ছেদে পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ সংবিধানের ভিত্তি কি হবে সে সম্পর্কে কয়েকটি মূলনীতি সংযোজন করা হয়। এগুলো হলো:

১. পাকিস্তান হবে একটি ইসলামি প্রজাতন্ত্র। পাকিস্তানে ইসলামি আদর্শ সংরক্ষণ করা হবে।
২. পাকিস্তানে সর্বজনীন প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, মৌলিক অধিকার ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতাসহ গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।
৩. যুক্তরাষ্ট্র ও এর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের মধ্যে এমনভাবে ক্ষমতা বণ্টন করতে হবে যেন প্রদেশগুলো সর্বোচ্চ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। তবে আইন, শাসন ও অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দিতে হবে যাতে তা পররাষ্ট্র ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারে।

৪. যেদিন প্রেসিডেন্ট আহ্বান করবেন সেদিনই জাতীয় পরিষদের অধিবেশন হবে। উক্ত দিবস হতে ১২০ দিনের মধ্যে জাতীয় পরিষদকে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে এবং তা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রমাণিত ও অনুমোদিত হতে হবে। যদি প্রেসিডেন্ট সংবিধান বিলকে প্রমাণকৃত, অনুমোদন কিংবা বৈধতা প্রদান করতে অস্বীকার করেন তাহলে সংবিধান কার্যকরী হবে না এবং জাতীয় পরিষদ ভেঙে যাবে। সংবিধান বিলে প্রেসিডেন্ট অনুমোদন না-দেয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের অধিবেশন আহ্বান করা যাবে না।

৫. আইনগত কাঠামো আদেশের অন্তর্ভুক্ত কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা প্রমাণ করবেন প্রেসিডেন্ট। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে এবং তা কোনো আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। 'আইনগত কাঠামো আদেশের' যে কোনো ধারা কেবল প্রেসিডেন্টই সংশোধন করতে পারবেন। এ বিষয়ে জাতীয় পরিষদের কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আসন বণ্টন

প্রদেশ	সাধারণ আসন	সংরক্ষিত মহিলা আসন	মোট
পূর্ব-পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯
পশ্চিম পাকিস্তান	৮২	৩	৮৫
সিন্ধু	২৭	১	২৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	২৫	১	২৬
বেলুচিস্তান	৪	১	৫
মোট	৩০০	১৩	৩১৩

প্রতিক্রিয়া: 'আইনগত কাঠামো আদেশ' জারি হলে বিভিন্ন মহল থেকে এ সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা হতে থাকে। 'আইনগত কাঠামো আদেশের' বিরুদ্ধে অন্যতম সমালোচনা ছিল এই যে, এতে প্রস্তাবিত জাতীয় পরিষদকে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি। এতে রাষ্ট্রপতির হাতে সংবিধান গ্রহণ-বর্জনের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। তবে 'আইনগত কাঠামো আদেশের' বিরুদ্ধে উত্থাপিত সর্বাপেক্ষা বড় সমালোচনা ছিল- ১. 'রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না করলে জাতীয় পরিষদের অবসান ঘটবে', ২. 'সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদের অবসান ঘটবে'-এরূপ বিধান সংযোজনের জন্য। এছাড়াও রাষ্ট্রপতি জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিলে কে, কীভাবে, কতদিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করবে সে সম্পর্কেও এ আদেশে কিছু বলা হয়নি।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ২৯ ১৯৭০ এর নির্বাচন

টপিক ২৯: ১৯৭০ এর নির্বাচন

This Topic is important for



MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (CMLA) জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন যে, ১৯৭০ সালের ৫ অক্টোবর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন উক্ত বছরের ২২ অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। রাজনৈতিক দলগুলো নীতিগতভাবে 'আইনগত কাঠামো আদেশ'-এর বিরোধিতা করলেও ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৭০ সালের এ নির্বাচন ৫ অক্টোবর ও ২২ অক্টোবরের পরিবর্তে ৭ ডিসেম্বর ও ১৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানের জলোচ্ছ্বাস ও ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত এলাকায় ১৯৭১ সালের ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানের ইতিহাসে ১৯৭০ সালেই সর্বপ্রথম প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২৫টি রাজনৈতিক দল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ '৬-দফা'কে বাঙালিদের অধিকারের 'ম্যাগনাকার্টা' হিসেবে উল্লেখ করে। আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনকে ৬-দফার প্রশ্নে 'রেফারেন্ডাম' অর্থাৎ 'গণভোট' হিসেবে গ্রহণ করার জন্য জনগণের নিকট আবেদন জানায়।

নির্বাচনে বিজয়ী হলে ৬-দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতিও আওয়ামী লীগ প্রদান করে। অপরদিকে পি.পি.পি. কখনো 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' এবং কখনো 'ইসলামি সমাজতন্ত্র' এবং সর্বদাই গণ-আন্দোলন বা বিপ্লবের কথা বলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক পুরাতন নেতৃত্বের পরিবর্তে নবীন ও নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আবেদন পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর পি.পি.পি. শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে প্রচারণা চালায়। দলটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয়ের কথা প্রচার করে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কোপন্থি ন্যাপ বা ওয়ালী ন্যাপ) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়। চীনাপন্থি ন্যাপ (বা ভাসানী ন্যাপ) ঘোষণা করে যে, সমাজতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন যে, ৬ দফা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত এবং এতে কৃষক-শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির কোনো কথা নেই। ৮৮ মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম প্রভৃতি ধর্মমনা এবং উগ্র ডানপন্থি দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রশ্নে 'গণভোট' বলে প্রচার করে। এসব দল তাদের বক্তব্য-বিস্তৃতিতে সব সময় আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের নীলনকশা বলে প্রচার করে।

নির্বাচনে বিজয়ী হলে ৬-দফা ও ১১ দফার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের প্রতিশ্রুতিও আওয়ামী লীগ প্রদান করে। অপরদিকে পি.পি.পি. কখনো 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' এবং কখনো 'ইসলামি সমাজতন্ত্র' এবং সর্বদাই গণ-আন্দোলন বা বিপ্লবের কথা বলে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো কর্তৃক পুরাতন নেতৃত্বের পরিবর্তে নবীন ও নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আবেদন পশ্চিম পাকিস্তানি জনগণের মনে আবেদন সৃষ্টি করে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর পি.পি.পি. শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষে প্রচারণা চালায়। দলটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সমাজতন্ত্র ও ইসলামের মধ্যে সমন্বয়ের কথা প্রচার করে।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মস্কোপন্থি ন্যাপ বা ওয়ালী ন্যাপ) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে এবং ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জানায়। চীনাপন্থি ন্যাপ (বা ভাসানী ন্যাপ) ঘোষণা করে যে, সমাজতন্ত্রই মুক্তির একমাত্র পথ। মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন যে, ৬ দফা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত এবং এতে কৃষক-শ্রমিক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির কোনো কথা নেই। ৮৮ মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম প্রভৃতি ধর্মমনা এবং উগ্র ডানপন্থি দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রশ্নে 'গণভোট' বলে প্রচার করে। এসব দল তাদের বক্তব্য-বিস্তৃতিতে সব সময় আওয়ামী লীগের ৬-দফা কর্মসূচিকে বিচ্ছিন্নতাবাদের নীলনকশা বলে প্রচার করে।

১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অত্যন্ত সুষ্ঠু, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১১টি রাজনৈতিক দল এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৫.০৯% এবং সমগ্র পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের হার ছিল ৫৭.৯৬%। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তান অংশের জন্য বরাদ্দ ১৬৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬৭টি আসন লাভ করে। অবশিষ্ট দুটি আসনের মধ্যে একটি আসন পি.ডি.পি. প্রধান নূরুল আমীন এবং অপর আসনটি লাভ করেন নির্দলীয় প্রার্থী চাকমা রাজা ত্রিদিব রায় চৌধুরী। অপরপক্ষে জুলফিকার আলী ভুটোর নেতৃত্বাধীন পি.পি.পি. জাতীয় পরিষদের পশ্চিম পাকিস্তান অংশের ১৪৪টি আসনের মধ্যে ৮৮টি আসন লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৮৮টি আসন এবং ৭০% ভোট লাভ করে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদে শতকরা ৯৮.৭টি আসন এবং প্রদত্ত ভোটের ৭৫.১১ ভাগ ভোট লাভ করে। এর ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ পরিষ্কারভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফল

এ নির্বাচনের ফলাফলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং আকর্ষণীয় দিক হলো এই যে, পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগ যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি, ঠিক তেমনি পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল পি.পি.পি.ও পূর্ব পাকিস্তানে কোনো আসন লাভে সক্ষম হয়নি। এ নির্বাচনের ফলাফলে তাই জাতীয়তার ও আঞ্চলিকতার উগ্র প্রভাব লক্ষ করা যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের মনোনীত ৮ জন প্রার্থীই পরাজিত হন এবং জনসমর্থন না থাকায় পি.পি.পি. পূর্ব পাকিস্তানে কোনো প্রার্থীই দাঁড় করায়নি।

১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের (জাতীয় পরিষদ)							
দলভিত্তিক ফলাফল ^{১০}							
রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন		সংরক্ষিত মহিলা আসন	উপজাতীয় এলাকার আসন	প্রাপ্ত মোট আসন সংখ্যা	পূর্ব পাকিস্তানে প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)	নির্বাচনী প্রতীক
	পূর্ব পাকিস্তান	পশ্চিম পাকিস্তান					
আওয়ামী লীগ	১৬০	—	৭	—	১৬৭	৭৫.১১	নৌকা
পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি	—	৮৩	৫	—	৮৮	—	—
মুসলিম লীগ (কাইয়ুম)	—	৯	—	—	৯	১.০৭	বাঘ
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	—	৭	—	—	৭	১.৬০	হারিকেন
ন্যাপ (ওয়ালী)	—	৬	১	—	৭	২.০৬	কুড়ে ঘন
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	—	২	—	—	২	২.৮১	সাইকেল
জামায়াত-ই- ইসলামী	—	৪	—	—	৪	৬.০৭	দাঁড়িপাল্লা
জমিয়তে উলামা ই-পাকিস্তান	—	৭	—	—	৭	২.৮৩	বই
জমিয়তে উলামা ই-ইসলাম	—	৭	—	—	৭	০.৯২	খেলুর গাছ
পি.ডি.পি.	১	—	—	—	১	২.৮১	ছাতা
স্বতন্ত্র / নির্দলীয়	১	৬	—	৭	১৪	৩.৪৭	
সর্বমোট =	১৬২	১৩১	১৩		৩০৬	১০০	

* অন্যান্য দলের ৪৬ জন প্রার্থী নির্বাচনে অংশ নিলেও কোনো আসন পায়নি।

১৯৭০ এর নির্বাচনের ফলাফল

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভার দলভিত্তিক নির্বাচনি ফলাফল^{৯১}

রাজনৈতিক দলের নাম	সাধারণ আসন	মহিলা আসন	মোট আসন	প্রাপ্ত ভোট (শতাংশ)
আওয়ামী লীগ	২৮৮	১০	২৯৮	৭০.৪৫
পি. ডি. পি.	২	—	২	১.৯৮
ন্যাপ (ওয়ালী)	১	—	১	৩.২৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	১	—	১	৪.৫০
নেজামে ইসলাম	১	—	১	১.৪৮
স্বতন্ত্র বা নির্দল	৭	—	৭	১০.৭৬
পরাজিত দলসমূহ	—	—	—	৭.৫৬
	৩০০	১০	সর্বমোট ৩১০	১০০

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩০ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী
লীগের জয়লাভের কারণ

টপিক ৩০: ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের কারণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল মাইলফলক। এ নির্বাচন ছিল অবিভক্ত পাকিস্তানের প্রথম ও শেষ অথবা বলতে গেলে জাতীয় পর্যায়ে একমাত্র সাধারণ নির্বাচন। বিশেষ করে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এ নির্বাচনের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ নির্বাচন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফাভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির বৈধতা প্রদান করে। ১৯৭০ সালের এ নির্বাচনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ তথা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গুরুত্ব বৃদ্ধি করে এবং পরবর্তী যেকোনো জাতীয় প্রশ্নে তাঁর নেতৃত্বের গুরুত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৭০ সালের এ নির্বাচনে কেন্দ্রীয় ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আইন পরিষদে আওয়ামী লীগের অভূতপূর্ব সাফল্যের পিছনে নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল :

১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উজ্জ্বল সংগ্রামী ভাবমূর্তি: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগের স্রষ্টা ও আওয়ামী লীগের প্রাণপুরুষ। পাকিস্তানি শাসনামলে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও স্বাধীন বিচারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন তথা স্বাধিকার অর্জনের জন্য আপসহীন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন, এজন্য তিনি জেল-জুলুম, নির্যাতন, নিপীড়ন সহ্য করেছেন। কিন্তু তিনি কখনো অন্যায়ের কাছে মাথানত করেন নি। বাঙালি জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক 'বাঙালি জাতীয়তাবাদে' বাঙালি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন। তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদের হাজার বছরের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিয়েছেন, অনুজ্জ্বল অতীতকে প্রোজ্জ্বল ভবিষ্যতের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। তিনি সংগ্রামের সিঁড়ি বেয়ে হয়ে উঠেছিলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, সকলের প্রিয় 'বঙ্গবন্ধু'। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে সব থেকে আলোচিত মানুষ ছিলেন তিনি। তাঁর 'ক্যারিজম্যাটিক লীডারশীপ' বা 'সম্মোহনী নেতৃত্ব' বাঙালি জনগণকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য নেতৃত্বের কারণেই ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছিল।

২. আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা: ১৯৪৯ সালে জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ হোসেন শহীদ সোহ্ৰাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নেতাদের নেতৃত্বে সংগঠিত ও পরিচালিত হয়েছিল। ১৯৫৫ সালের পর থেকে আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষ ও উদার রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণের নিকট সমাদৃত হয়ে উঠতে থাকে। ১৯৬৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হলে এবং ১৯৬৬ সালে ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে দ্রুত এ রাজনৈতিক দলটি এবং তাদের কর্মসূচি ও পদক্ষেপসমূহ জনগণের নিকট সমাদৃত হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ এ সময়কালে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিক দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর প্রভাব পড়ে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জনগণ এজন্যই আওয়ামী লীগকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদান করে।

৩. ৬-দফা কর্মসূচির জনপ্রিয়তা: ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে অতি দ্রুত তা 'বাঙালির বাঁচার দাবি' এবং 'মুক্তি সনদ' হিসেবে স্বীকৃত ও সমাদৃত হয়। ৬-দফা বাঙালি জনগণের 'ম্যাগনাকার্টায়' পরিণত হয়। ৬ দফা-বাঙালি জনগণকে স্বাধিকার আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে।

৪. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য: ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ, আমলা, সেনাকর্মকর্তা, শিল্পপতি, ব্যবসায়ীদের শোষণ-নির্যাতন। উভয় প্রদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে বেড়ে চলে রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য। পূর্ব পাকিস্তান পরিণত হয় পশ্চিম পাকিস্তানি শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের জন্য কাঁচামালের যোগানদাতা একটি উপনিবেশে। যে গুটিকয়েক শিল্প-কলকারখানা পূর্ব পাকিস্তানে তারা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেগুলো থেকে প্রাপ্ত লভ্যাংশ বা পুঁজি তারা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করতো। প্রশাসনের উচ্চপদে এবং সামরিক বাহিনীতে বাঙালির সংখ্যা ছিল অতি সামান্য। স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর হেডকোয়ার্টার এবং রাজধানী ছিল সবই পশ্চিম পাকিস্তানে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে। এসব বৈষম্যের অবসানের জন্যই শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এ বৈষম্যের দুঃসহ মানসিক যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবার জন্যই বাঙালি জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে একচেটিয়া ভোট প্রদানে উদ্বুদ্ধ করে।

৫. মৌলিক গণতন্ত্রীদের বাড়াবাড়ি: আইয়ুব খান সর্বজনীন ভোটাধিকারের পরিবর্তে সমগ্র পাকিস্তানে আশি হাজার 'মৌলিক গণতন্ত্রীর' (Basic Democrats) হাতে ভোটাধিকার অর্পণ করেন। এরাই রাষ্ট্রপতি থেকে আইন পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন করতেন। পাশাপাশি এরা ইউনিয়ন কাউন্সিল ও পৌরসভাও পরিচালনা করতেন। এদের দাপট ছিল অসামান্য। এর পিছনে ছিল আইয়ুব-মোনায়েম খানের প্রশ্রয়। এরা অন্ধভাবে, আইয়ুব-মোনায়েম খানকে এবং তাদের 'কনভেনশন মুসলিম লীগকে' সমর্থন দিত। বিনিময়ে পেতো খেয়াল খুশিমত পৌরসভা ও ইউনিয়ন কাউন্সিল পরিচালনা এবং স্থানীয় পর্যায়ে রিলিফ বণ্টন ও চুরি এবং নানা ধরনের দুর্নীতিতে নিমজ্জিত হবার অবাধ ক্ষমতা। এ মৌলিক গণতন্ত্রীদের বাড়াবাড়ি আচরণ এদেশের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলে। আওয়ামী লীগ এদের অন্যায় কার্যকলাপের ঘোর বিরোধী ছিল। এজন্যই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ম্যান্ডেট প্রদান করে।

৬. আমলা সেনাবাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধি: আইয়ুব-ইয়াহিয়ার শাসনামলে পাকিস্তানের রাজনীতি ও প্রশাসনে আমলা-সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা সীমাহীনভাবে বেড়ে যায়। আমলা-সেনা কর্মকর্তাগণ নগ্নভাবে রাজনীতি ও প্রশাসনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে হস্তক্ষেপ করতেন। সচেতন বাঙালি জনগণ এর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবুর রহমান বরাবর এর বিরোধিতা করে আসছিলেন। ফলে জনগণের ভালোবাসা তারা অর্জনে সক্ষম হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এর প্রভাব পড়ে।

৭. জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার: ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের ফলে যে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার' উন্মেষ ঘটে তা ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন ও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে, ৬-দফা কর্মসূচিভিত্তিক আন্দোলনে, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলনে আরো বিকশিত হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় ছিল মূলত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিজয়।

৮. সরকারি দমননীতি ও পুলিশি নির্যাতন: ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সকল আন্দোলন-সংগ্রামে ক্ষমতাসীন পাকিস্তান সরকার জনগণের ওপর দমন-পীড়ন ও নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ জনগণ এর জবাব দিয়েছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তাদের পরিবর্তে আওয়ামী লীগকে ভোট প্রদান করে।

৯. ধর্মকে রাজনীতির হাতিয়ারে পরিণত করা: ১৯৪৭ সাল থেকে মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ডানপন্থি দলগুলো ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নগ্নভাবে ব্যবহার করে আসছিলো। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর নেতাদেরকে তারা 'কাফের', 'ইসলাম বিরোধী', 'কম্যুনিষ্ট', 'ভারতের দালাল', 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ইত্যাদি অপবাদ দিত। জনগণ এসব স্বার্থান্ধ ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহারকারী রাজনৈতিক দলগুলোর উদ্দেশ্য ও কৌশল বুঝতে সক্ষম হয়। এজন্যই জনগণ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এসব উগ্র ডানপন্থি ও ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারকারী দলের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। ১৯৭০ সালে এজন্যই সচেতন, উদার ও গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ আওয়ামী লীগের মতো উদার ও প্রগতিশীল দলকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন

১৯৭১ সালের ১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার অপ্রত্যাশিত ঘোষণায় সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। স্বাধিকার আন্দোলন পরিণত হয় স্বাধীনতা আন্দোলনে। 'জয় বাংলা', 'পদ্মা মেঘনা যমুনা-তোমার আমার ঠিকানা', 'জনগণের একদফা-বাংলার স্বাধীনতা', 'তোমার দেশ-আমার দেশ-বাংলাদেশ বাংলাদেশ', 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর-বাংলাদেশ স্বাধীন কর' প্রভৃতি শ্লোগানে চতুর্দিক মুখরিত হয়ে ওঠে। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে স্বাধীনতার দাবি উচ্চারিত হতে থাকে। ১ মার্চ বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী, ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক শাজাহান সিরাজ, 'ডাকসু' সহ-সভাপতি আ. স. ম. আব্দুর রব এবং ডাকসু সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন এক বৈঠকে বসে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। এদিন রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণ-জোয়ারকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য ২ ও ৩ মার্চ দুদিনের জন্য 'সাক্ষ্য আইন' জারি করেন। কিন্তু জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তা ভঙ্গ করে রাস্তায় নেমে আসে। ঢাকা শহরে কার্টু ভেঙ্গে উত্তেজিত জনগণ শহীদদের লাশ নিয়ে মিছিল করে। মিছিলরত জনগণের উপর গুলিবির্ষিত হলে ১১৩ জন শহীদ এবং অসংখ্য মানুষ আহত হন। এর প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২ মার্চ ঢাকায় এবং ৩ মার্চ সারাদেশে হরতাল আহ্বান করেন।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন

২ মার্চ হরতাল চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের' ছাত্র সমাবেশে স্বাধীন বাংলার মানচিত্র খচিত বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ গণসমাবেশে স্বাধীন বাংলাদেশ ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা করেন। ৯৪ এ ইশতেহারে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের কবল হতে মুক্ত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা, নির্ভেজাল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করে 'কৃষক শ্রমিকরাজ' কায়েম করার শপথ গ্রহণ করা হয়। এ ইশতেহারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের সর্বাধিনায়ক' ঘোষণা করা হয়।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন

এদিনের এ ছাত্র-গণ জমায়েতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি এদিন এ সমাবেশে তাঁর ভাষণে স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে 'অসহযোগ আন্দোলনের' ডাক দেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, "খুনি ইয়াহিয়া সরকারের হঠকারী ও পাশবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে আজ থেকে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে। কল-কারখানা বন্ধ থাকবে, অফিস-আদালত বন্ধ থাকবে। রেলগাড়ির চাকা ঘুরবেনা, খাজনা-ট্যাক্স দেওয়া চলবে না এবং ব্যাংক বন্ধ থাকবে।" ৪ মার্চ বিক্ষুব্ধ শিল্পীরা বেতার ও টেলিভিশন বর্জনের ঘোষণা প্রদান করেন। ৫ মার্চ টঙ্গীতে জনতার প্রতিবাদ মিছিলে গুলি বর্ষণ করা হলে ৪ জন শহীদ এবং ২৫ জন আহত হন। ৬ মার্চ চট্টগ্রামে গুলিতে শহীদ হন ১৩৮ জন। এদিন ছাত্রলীগের সভায় 'স্বাধীন বাংলাদেশ' ঘোষণার প্রস্তাব (৩ মার্চ গৃহীত) সাংগঠনিকভাবে অনুমোদিত হয়। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দেন। অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি সর্বত্র শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হতে থাকে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩১ ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

টপিক ৩১: ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭১ সালের ৬ মার্চ ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ভাইস এডমিরাল এস. এম. আহসানকে অপসারণ করে 'বেলুচিস্তানের কসাই' নামে কুখ্যাত লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নতুন গভর্নর নিয়োগ করেন। কিন্তু বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকী তাকে গভর্নর হিসেবে শপথ বাক্য পাঠ করাতে অস্বীকার করেন।

প্রচণ্ড গণবিস্ফোরণের মুখে বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে ৬ মার্চ ঘোষণা করেন যে, ২৫ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে এবং তার পূর্বে ১০ মার্চ ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য সংসদীয় দলসমূহের নেতাদের এক ঘরোয়া বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ ঘোষণার মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস লক্ষ্য করে ঘোষণা করেন যে, "বাঙালির তাজা রক্ত মাড়িয়ে আমি কোনো সম্মেলনে বসতে পারি না।"

নির্বাচন পরবর্তী ষড়যন্ত্র বৃদ্ধি পেলে এবং ৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘোষণার পর ৭ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) এক ঐতিহাসিক জনসভায় বিপ্লবী নেতা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উদাত্তকণ্ঠে যে ঘোষণা প্রদান করেন তা 'বাঙালি জাতির ইতিহাসে স্মরণীয় দলিল এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষণ' হিসেবে বিখ্যাত হয়ে থাকবে। তিনি জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে,

ভাইয়েরা আমার, আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বুঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কি অন্যায় করেছিলাম, নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল এসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এদেশকে আমরা গড়ে তুলবো। এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সাথে বলতে হয়, তেইশ বৎসরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। তেইশ বৎসরের ইতিহাস মুমূর্ষু নরনারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এদেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।

১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে দশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ছয়দফা আন্দোলনে ৭ই জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯-এর আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পর যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন। আমরা মেনে নিলাম।

তারপরে অনেক ইতিহাস হয় গেলো, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আপ-ি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা এসেম্বলিতে বসবো। আমি বললাম, এসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করবো; এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।

জনাব ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ না, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা আলাপ করলাম, আপনারা আসুন বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে, তাহলে কসাইখানা হবে এসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলা হবে, যদি কেউ এসেম্বলিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, এসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ মার্চের ১ তারিখে এসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে এসেম্বলি ডেকেছিলেন। আমি বললাম, আমি যাবো। ভুট্টো বললেন, তিনি যাবেন না। ৩৫ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করার পর মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সব কিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কি পেলাম আমরা? যে আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে, তার বুকের উপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু। আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। টেলিফোনে আমার সঙ্গে তার কথা হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, জনাব ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কিভাবে আমার গরিবের উপর, আমার বাংলার মানুষের উপর গুলি করা হয়েছে, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কি করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন। তিনি বললেন, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি কীসের রাউন্ড টেবিল, কার সাথে বসবো? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে তাদের সাথে বসবো? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার উপরে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের উপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার,

২৫ তারিখে এসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, ঐ শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। এসেম্বলি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথমে, সামরিক আইন মার্শাল ল' উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখবো, আমরা এসেম্বলিতে বসতে পারবো কি পারবো না। এর পূর্বে এসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এদেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাচারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সেজন্য সমস্ত অন্যান্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলির হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিক্সা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাই কোর্ট, জজ কোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন।

এর পরে যদি বেতন দেওয়া না হয়, আর যদি একটি গুলি চলে, আর যদি আমার লোকদের হত্যা করা হয়-তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু-আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারবো, আমরা পানিতে মারবো। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের উপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদুুর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করবো। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই সাতদিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইরা যোগদান করেছে, প্রত্যেকটা শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছিয়ে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি, তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হবে ততদিন খাজনা-ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো- কেউ দেবে না। শুনন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে, নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপরে। আমাদের যেন বদনাম না হয়।

মনে রাখবেন, রেডিও টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে যাতে মানুষ তাদের মায়নাপত্র নিবার পারে।

কিন্তু পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বিদেশের সাথে দেয়ানেয়া চলবে না।
কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝে শুনে কাজ করবেন।
প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩২ মুজিব-ইয়াহিয়া-ভুট্টো আলোচনা

টপিক ৩২: মুজিব-ইয়াহিয়া-ভূট্টো আলোচনা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসেন। ১৬ মার্চ থেকে ঢাকায় মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে জুলফিকার আলী ভুট্টো ও শীর্ষস্থানীয় পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবর্গ এ আলোচনায় যোগদান করেন। আলোচনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগের অসহযোগ আন্দোলনও চলতে থাকে। কিন্তু জল্লাদ ইয়াহিয়া ও ষড়যন্ত্রের নায়ক জুলফিকার আলী ভুট্টো আলোচনা দীর্ঘায়িত করে এ সুযোগে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে সেনাবাহিনী এবং সামরিক সাজ-সরঞ্জাম গোপনে আনার কাজটি সম্পন্ন করেন। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর সলাপরামর্শ এবং সেনাবাহিনীর সন্দেহজনক গতিবিধি ঢাকা শহরকে উত্তপ্ত করে তোলে। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে সমগ্র ঢাকা শহরে পাকিস্তানি পতাকার পরিবর্তে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। ফলে মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক নাটকীয় রূপ পরিগ্রহ করে। কিন্তু এ বৈঠক ছিল কালক্ষেপণ মাত্র। আলোচনা বৈঠকের নাম করে আসলে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্র ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সেনাবাহিনী ও সামরিক সরঞ্জামাদি এসে পৌঁছার পর পরই তাই ২৫ মার্চ সন্ধ্যা রাতে কোনো ঘোষণা প্রদান ব্যতিরেকে এবং কাউকে না জানিয়ে ইয়াহিয়া-ভুট্টো ঢাকা ত্যাগ করেন। ঢাকা ত্যাগের পূর্বেই প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালানোর আদেশ সেনাবাহিনীকে প্রদান করেন।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩৩ ২৫ মার্চের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

টপিক ৩৩: ২৫ মার্চের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার ভান করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য ও যুদ্ধ সরঞ্জাম ঢাকায় নিয়ে আসার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এরপর বাঙালিদেরকে হত্যা করার হুকুম জারি করে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ত্যাগ করেন। সেনাবাহিনী অভিযান শুরু করে রাত ১১.৩০ টায়। শুরু হয় বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ। সমস্ত হিংস্রতা ও উন্মত্ততা নিয়ে নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এ অপারেশনের নাম ছিল 'অপারেশন সার্চ লাইট'। ঢাকা নগরী ও এর আশেপাশের এলাকায় হামলার নেতৃত্বে ছিলেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আরবাব এবং ঢাকা ছাড়া সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে অপারেশনের দায়িত্ব পান মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা। 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক মানবনিধনের লক্ষ্যে পরিচালিত এ মিশনের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন কুখ্যাত খুনি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান।

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী এবং ব্রিগেডিয়ার আরবাবকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল ঢাকার পিলখানায় ই.পি.আর (বর্তমানে বিজিবি) হেড কোয়ার্টার, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রেডিও সেন্টার, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, স্টেট ব্যাংক আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণে নেয়া এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করাসহ ঢাকা শহরে সেনাবাহিনীর সার্বিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। প্রয়োজনে সবকিছু ধূলিস্যাৎ করে দেয়ার হুকুমও দেওয়া হয়। আন্দোলনের সূতিকাগার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের আক্রমণের অন্যতম শিকার হিসেবে চিহ্নিত করতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এক মুহূর্তও দেরি করেনি। এমনকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিপ্রিয় ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের ওপর হামলা চালাতেও তারা দ্বিধা করেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আক্রমণ চালিয়ে বহু ছাত্রছাত্রীকে তারা নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও হাজার হাজার নিরীহ শ্রমিক, বস্তিবাসীকে তারা ঘুমন্ত অবস্থায় হত্যা করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যবস্তু ছিল রাজারবাগ পুলিশ লাইন। এখানে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এখানে পাকিস্তানি সেনারা ট্যাংক বাহিনী পর্যন্ত ব্যবহার করে। পিলখানার ই.পি.আর. বাহিনীর (বর্তমানের বিজিবি-এর পূর্বসূরি) ওপরও তারা আক্রমণ চালায়। যারা পালাতে সক্ষম হয়নি তারা নৃশংসভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হত্যার শিকার হয়। ইয়াহিয়ার জল্লাদ ও খুনি বাহিনী ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে মানুষের সর্বস্ব ধ্বংস করে দেয়। এভাবে ২৫ মার্চের রাতে অতর্কিত হামলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষক ও ৩০০ জন ছাত্র-কর্মচারীসহ ঢাকায় প্রায় ৫০ হাজার নিরীহ নরনারীকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এছাড়া ঢাকার বাইরে বিভিন্ন সেনানিবাস ও ই.পি.আর ক্যাম্পে আক্রমণ চালিয়ে কয়েক হাজার বাঙালি সেনা ও ই.পি.আর জওয়ানকে পাকিস্তানি সেনারা নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে। এ হত্যাকাণ্ডের দ্বারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। ২৫ মার্চ রাত দেড়টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩৪ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

টপিক ৩৪: বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড শুরু করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তখনই স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ২৫ মার্চ রাত দেড়টার পর (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হবার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু টি.এন্ড.টি ও ই.পি.আর (বর্তমান বি.জি.বি)-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে স্বাধীনতার ঘোষণা পৌঁছে দেন। এ ঘোষণাটি ছিল ইংরেজিতে এবং তার বঙ্গানুবাদ নিম্নরূপ : "ইহাই হয়ত আমার শেষ বার্তা, আজ হইতে বাংলাদেশ স্বাধীন। আমি বাংলাদেশের জনগণকে আহ্বান জানাইতেছি যে, যে যেখানে আছে, যাহার যাহা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও।”

(This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I Call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved.)

চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা জহুর আহমেদ চৌধুরীকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত স্বাধীনতার বার্তাটি সে রাতেই পৌঁছে দেয় চট্টগ্রাম ওয়ারেন্স বিভাগ। তিনি এবং চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সভাপতি জনাব এম. এ. হান্নান এ স্বাধীনতার ঘোষণাবার্তার বঙ্গানুবাদ করেন। সে রাতেই তা সাইক্লোস্টাইল করে চট্টগ্রাম শহরে জনগণের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয় এবং মাইকযোগে তা প্রচার করা হয়। ২৬ মার্চ সকালেই স্বাধীনতার এ ঘোষণা চট্টগ্রাম শহরের সর্বত্র এবং গ্রামাঞ্চলেও প্রচারিত হয়।

২৬ মার্চ দুপুর প্রায় ২টা ৩০ মিনিটের সময় জনাব এম. এ. হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে (আগ্রাবাদ) সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৭ কিন্তু আগ্রাবাদে অবস্থিত বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা যুদ্ধ জাহাজের শেলিং আওতার মধ্যে থাকায় "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র" কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টারে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৪০ মিনিট থেকে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট ট্রান্সমিটিং সেন্টার থেকে "স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের" কর্মতৎপরতা আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়।

আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা একজন সামরিক কর্মকর্তার দ্বারা পাঠ করার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। নিকটস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে পদমর্যাদায় সিনিয়র মেজর জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ সন্ধ্যাবেলা কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান ইংরেজিতে বঙ্গবন্ধুর নামে ও তাঁর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ৯৯ ২৮ এবং ৩০ মার্চ আবারও তিনি কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। তাঁর পাঠ করা এ ঘোষণাপত্রটি ছিল নিম্নরূপ :

"The Government of the sovereign state of Bangladesh, on behalf of our Great Leader, the Supreme Commander of Bangladesh Sheikh Mujibur Rahman, we hereby proclaim the independence of Bangladesh and that the Government headed by Sheikh Mujibur Rahman has already been formed. It is further proclaimed that Sheikh Mujibur Rahman is the sole leader of the elected representatives of Seventy Five Million people of Bangladesh, and the Government headed by him is the only legitimate government of the people of the Independent sovereign state of Bangladesh, which is legally and constitutionally formed, and is worthy of being recognised by all the governments of the world. May Allah help us. Joy Bangla."

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩৫ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ

টপিক ৩৫: স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে বর্বর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে বাঙালি জনগণের ওপর আক্রমণ চালায়। এরূপ অবস্থায় নিজেদের নিরাপত্তার খাতিরে সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যদের পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়ার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ে। রাজনৈতিকভাবে বাঙালি সৈনিকদের প্রতি সুস্পষ্ট পূর্ব নির্দেশনার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সামরিক, আধা-সামরিক, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যরা পক্ষ ত্যাগ করে স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী ও জনগণের সহযোগিতায় স্থানীয়ভাবে নিজ নিজ মতো করে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। প্রায় সর্বত্রই স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসন এ ব্যাপারে সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। এভাবে প্রতিরোধের ধারাবাহিকতায় সমগ্র জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তথা অবাঙালিদের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয় এবং ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বসবাসকারী চাকমা ব্যতীত বেশির ভাগ উপজাতিও এ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল অসংগঠিত; উপস্থিত স্থানীয় নেতৃত্ব নির্ভর এবং অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র সজ্জিত একটি প্রবল শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় নিরস্ত্র জনতার আত্মরক্ষায় মরিয়া প্রয়াসজাত এক অসম লড়াই। অনিবার্যরূপে এ ছিল সশস্ত্র সংগ্রামের এক খণ্ডিত পর্যায়। এ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রতিরোধী শক্তির প্রাথমিক পরাজয় ঘটা সত্ত্বেও তাদের ত্যাগ, বীরত্ব ও অসমসাহসিকতার অত্যাশ্চর্য নিদর্শনাবলি গভীর প্রেরণার উৎস ছিল।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত ১২টার পরপরই (অর্থাৎ ২৬ মার্চ) পাকিস্তানি সৈন্যদের হাতে বন্দি হবার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। তবে এদেশের অনেক স্থানে এর আগেই জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এরূপ একটি বড় প্রতিরোধ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ গাজীপুর চৌরাস্তায়, যা 'জয়দেবপুর প্রতিরোধ যুদ্ধ' নামে পরিচিত।

পাকিস্তানি সামরিক জাস্তা ১৯৭১ সালের শুরু থেকেই বেঙ্গল রেজিমেন্টের ইউনিটগুলোকে ঢাকার বাইরে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের এক জায়গায় না রেখে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে রাখার সামরিক কৌশল ছিল এটি। এ লক্ষ্যে জয়দেবপুর সেনানিবাসে অবস্থানরত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে চারভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী। এ সময় জয়দেবপুর রেজিমেন্টের অধিনায়ক ছিলেন লে. কর্নেল মাসুদুল হাসান এবং উপ-অধিনায়ক ছিলেন মেজর শফিউল্লাহ। দুজনেই বাঙালি। ১৯ মার্চ ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ৫৭ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার জাহানজেব আরবাবের নেতৃত্বে একটি সেনাদল ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সকাল ১০-১১ টার মধ্যে জয়দেবপুর রাজবাড়িতে পৌঁছায়। এ সময় জয়দেবপুরের আন্দোলনরত জনগণ মনে করলেন যে, পাকিস্তানি সেনারা এখানকার বাঙালি সেনাদের নিরস্ত্র করতে এসেছে। স্থানীয় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে ও আহ্বানে তাৎক্ষণিকভাবে কয়েক হাজার মানুষ জয়দেবপুর রেলস্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা দুটি মালবাহী বগিকে টেনে এনে লেভেল ক্রসিংয়ে রেখে দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করে। এদিকে জয়দেবপুরস্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যরাও সাধারণ জনগণের মতোই আশঙ্কা করছিল যে, ব্রিগেডিয়ার আরবাব তাদের হাতে থাকা অস্ত্র কেড়ে নিতেই এসেছেন। এজন্য তারাও এমনভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন যেন, সহজে পাকিস্তানি সেনারা তাদের নিরস্ত্র করতে না পারে।

ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুর বাজারের কাছে লেভেল ক্রসিংয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অধিনায়ক লে. কর্নেল মাসুদুল হাসানকে যেকোনোভাবে হোক উপস্থিত জনতা এবং মালবাহী বগি দুটোকে দ্রুত সরিয়ে ফেলার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করেন। এজন্য প্রয়োজনে গুলি চালানোরও নির্দেশ দেন। লে. কর্নেল মাসুদুল হাসান এবং সেকেন্ড বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানির বাঙালি অধিনায়ক মেজর মইনুল হোসেন ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ব্রিগেডিয়ার আরবাব তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্য এবং উত্তেজিত বাঙালি জনগণকে

ব্রিগেডিয়ার আরবাব জয়দেবপুর বাজারের কাছে লেভেল ক্রসিংয়ে বাধার সম্মুখীন হয়ে সেকেন্ড বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি অধিনায়ক লে. কর্নেল মাসুদুল হাসানকে যেকোনোভাবে হোক উপস্থিত জনতা এবং মালবাহী বগি দুটোকে দ্রুত সরিয়ে ফেলার জন্য কড়া নির্দেশ জারি করেন। এজন্য প্রয়োজনে গুলি চালানোরও নির্দেশ দেন। লে. কর্নেল মাসুদুল হাসান এবং সেকেন্ড বেঙ্গলের ডেল্টা কোম্পানির বাঙালি অধিনায়ক মেজর মইনুল হোসেন ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী জনতাকে বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ব্রিগেডিয়ার আরবাব তখন বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্য এবং উত্তেজিত বাঙালি জনগণকে গালিগালাজ করছিলেন। ব্রিগেডিয়ার আরবাব এর উপর্যুপরি কড়া নির্দেশ উপেক্ষা না করতে পেরে মেজর মইনুল হোসেন আকাশের দিকে এবং পাশের খাল-বিলের কচুরিপানা লক্ষ্য করে ফাঁকা গুলি চালান। ব্যারিকেড সৃষ্টিকারী জনগণ তাদের হাতে থাকা দেশীয় গাদা বন্দুক এবং পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে কেড়ে নেয়া ৪/৫টি চায়নিজ রাইফেল দিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। কিন্তু পাকিস্তানি সেনাদের সামনে বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনারা থাকায় উত্তেজিত জনগণকে খুব সাবধানে এমনভাবে গুলি চালাতে হয় যেন বাঙালি সেনাদের গায়ে গুলি না লাগে। প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে চলে এই হাতাহাতি প্রতিরোধ যুদ্ধ। এরপর মেজর মইনুলের অনুরোধে উত্তেজিত জনতা শান্ত হয় এবং ব্যারিকেড সরিয়ে নেয়।

পাকিস্তানি সেনারা দ্রুত ঢাকা সেনানিবাসে ফিরে যায়। তবে যাবার সময় তারা আকস্মিকভাবে জনতার উপর গুলি চালালে অনেকেই নিহত ও আহত হয়। ২৮ মার্চ অপরাহ্নে মেজর শফিউল্লাহ এবং লে. হেলাল মোর্শেদ খান তাদের অধীন সৈন্যদের নিয়ে ময়মনসিংহে অবস্থানরত মেজর নূরুল ইসলামের (শিশু) কোম্পানির সাথে মিলিত হন। মেজর মইনুল ইসলাম চৌধুরীও তাঁর অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে মেজর শফিউল্লাহ সাথে মিলিত হন। ২৯ মার্চ থেকে মেজর শফিউল্লাহ নেতৃত্বে ২য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে।

২৯ মার্চ বিকেলে যশোর ক্যান্টনমেন্টের ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের চারপাশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সশস্ত্র অবস্থান নেয়। ৩০ মার্চ যশোর সেনানিবাসের ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার দুররানী ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অস্ত্রাগারের চাবি হস্তগত করলে বাঙালি সেনারা শঙ্কিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবে বাঙালি সৈনিকেরা অস্ত্রাগারের তালা ভেঙে ফেলে এবং অস্ত্র হাতে নিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বাঙালি সেনা অফিসার লে. হাফিজ উদ্দিন এবং লে. আনোয়ার-এর নেতৃত্বে বাঙালি সৈন্যরা পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে মুখোমুখি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। বিকেল ৪.৩০ মি. পর্যন্ত এ যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে লে. আনোয়ারসহ ৪০ জন বাঙালি সৈনিক শহিদ হন। বহু পাকিস্তানি সৈন্য এ যুদ্ধে প্রাণ হারায়। লে. হাফিজ উদ্দিনের নেতৃত্বে বাঙালি সৈন্যরা নতুনভাবে সংগঠিত হয়ে চৌগাছায় একত্রিত হয়ে পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান।

মার্চের প্রথম থেকেই অন্যান্য ক্যান্টনমেন্টের মতোই সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি সৈন্যদেরকেও বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হয়। উদ্দেশ্য একটাই এবং তা হলো তারা যেন সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে না পারে। ২৬ ও ২৭ মার্চ সৈয়দপুরে পাকিস্তানি সেনাদের প্রত্যক্ষ মদদে বিহারী জনগণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাঙালি জনগণের উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায় এবং বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালায়। ৩১ মার্চ ২টা ৩০ মিনিটে সৈয়দপুর ক্যান্টনমেন্টের অবাঙালি সৈন্যরা ৩য় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালায়। এর ফলে অনেক বাঙালি সৈনিক এই আক্রমণে প্রাণ হারান। যাঁরা বেচে যান তাঁরা ক্যাপ্টেন আনোয়ারের নেতৃত্বে দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িতে একত্রিত হন। শুরু হয় সশস্ত্র যুদ্ধ।

কুমিল্লা সেনানিবাসের ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সেনা অফিসার ও সৈনিকদের ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকেই বিভক্ত করে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হতে থাকে। এরূপ নির্দেশে মেজর খালেদ মোশাররফ ১ কোম্পানি সৈন্যসহ ২৪ মার্চ শমশের নগর যাবার পথে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থানরত মেজর শাফায়াত জামিলের সাথে অনির্ধারিত আলোচনায় মিলিত হয়ে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ক্যাপ্টেন গাফফারও ক্যান্টনমেন্ট থেকে পালিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া অভিমুখে রওয়ানা হন। ২৫ মার্চ মধ্যরাতেই ৪র্থ বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিকাংশ সৈনিক ও অফিসার ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মিলিত হন। এর মধ্যে তাঁরা এবং স্থানীয় নেতা ও জনগণ ঢাকার গণহত্যা সম্পর্কে জানতে পেরে উত্তেজিত হয়ে উঠেন। ২৭ মার্চ সকাল ১০ টায় মেজর শাফায়াত জামিল তাঁর ইউনিটের অবাঙালি অধিনায়ক লে. কর্নেল খিজির হায়াত খানসহ সকল অবাঙালি অফিসার ও সৈনিককে গ্রেপ্তার করে ব্রাহ্মণবাড়িয়া বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইউনিটে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা প্রদান করেন। এদিন দুপুর ১২টায় মেজর খালেদ মোশাররফ ব্রাহ্মণবাড়িয়া পৌঁছান এবং ৪র্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। শুরু হয় প্রত্যক্ষ মুক্তিযুদ্ধ।

১৯৭১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি এম. ভি. সোয়াত জাহাজ বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর জেটিতে আশ্রয় নিলে স্থানীয় বাঙালি জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা এসব অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ যেন নামাতে না পারে সেজন্য ব্যারিকেড তৈরি করে। এসময় চট্টগ্রামস্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারের কমান্ডান্ট ছিলেন ব্রিগেডিয়ার মাহমুদুর রহমান মজুমদার নামক একজন সিনিয়র বাঙালি অফিসার। পাকিস্তানি সামরিক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ব্রিগেডিয়ার মজুমদারকে জনতার প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ জাহাজ থেকে নামানোর কঠোর নির্দেশ প্রদান করে। প্রয়োজনে গুলি চালানোর নির্দেশ প্রদান করা হয়। ব্রিগেডিয়ার মজুমদার প্রতিরোধকারী বাঙালি জনতার উপর গুলি না চালালে তাঁর জায়গায় অবাঙালি ব্রিগেডিয়ার আনসারীকে নিযুক্ত করা হয়। ব্রিগেডিয়ার আনসারি অস্ত্র খালাস ও রাস্তার ব্যারিকেড সরানোর জন্য স্থানীয় অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টকে নির্দেশ প্রদান করে। সেখানে অবস্থানরত নৌবাহিনীকেও দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করা হয়।

অষ্টম বেঙ্গল রেজিমেন্টের অবাঙালি অধিনায়ক লে. কর্নেল রশীদ জানজুয়ার নির্দেশে সহ-অধিনায়ক বাঙালি মেজর জিয়াউর রহমান ২৫ মার্চ রাত ১১টায় চট্টগ্রাম পোর্টের দিকে অগ্রসর হন জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নামানোর জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে তিনি ক্যাপ্টেন খালেবুজ্জামান চৌধুরীর নিকট সংবাদ পান যে, চট্টগ্রাম সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনারা সেখানকার বাঙালি সেনাদের হত্যা করা শুরু করেছে। মেজর জিয়া পোর্টের দিকে না অগ্রসর হয়ে ৮ম বেঙ্গল রেজিমেন্টাল ছাউনিতে ফিরে এসে দ্রুত লে. কর্নেল জানজুয়াকে গ্রেপ্তার ও পরে হত্যা করেন। তিনি রেজিমেন্টের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন এবং ২৬ মার্চ ভোরে পটিয়ায় চলে যান। ২৭ মার্চ পটিয়ায় থাকাকালীন তিনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।

২৫ মার্চ রাত ১১টা ৩০ মিনিটে বেঙ্গল রেজিমেন্টের চট্টগ্রামস্থ নবগঠিত ৯ম ইউনিটের প্রশিক্ষণরত প্রায় সকল সৈনিককে পাকিস্তানি সেনারা আকস্মিক আক্রমণ করে নির্মমভাবে হত্যা করে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে লে. কর্নেল এম. আর চৌধুরীসহ ৮ জন অফিসার ও ১৫০০ সৈন্যকে নির্মমভাবে পাকিস্তানি সেনারা হত্যা করে। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়াসহ কিছু সংখ্যক অফিসার ও সৈন্য পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন পালিয়ে গিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মেজর খালেদ মোশাররফ-এর বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হন। ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া ২৬ মার্চ কুমিরায় পাকিস্তানি সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন।

চট্টগ্রামস্থ ই.পি.আর বাহিনীর বাঙালি সদস্যগণ তাদের সেক্টরের অ্যাডজুটেন্ট ক্যাপ্টেন রফিকের নেতৃত্বে ২৫ মার্চ রাত সাড়ে নয়টায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ক্যাপ্টেন রফিক তাঁর সেক্টরের ১০০০ ই.পি.আর-এর মধ্যে ৩০০ জন অবাঙালি ই.পি.আরকে নিরস্ত্র করেন।

২৫ মার্চ রাত থেকে ২৬ মার্চ বিকেল ৪টা পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা আক্রান্ত রাজারবাগ পুলিশ লাইনের বীর বাঙালি পুলিশরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এ প্রতিরোধ যুদ্ধে প্রাণ হারায় ৭০০ জন পুলিশ। এমনকি বংশাল থানার পুলিশরাও সে রাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। মিরপুরেও পুলিশ প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩৭ বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ

টপিক ৩৭: বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	কখ গঘ

পটভূমি: বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে অবস্থানরত ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য (এম.এন.এ.) ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যগণ (এম.পি.এ) এ সময়ে 'স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার' গঠনের চিন্তাভাবনা শুরু করেন। এ লক্ষ্যে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দিন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরাগান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠনের পর সেদিনই ঘোষণা করা হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ' ও 'আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণের আদেশ'। নিম্নে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ হুবহু তুলে ধরা হলো:

১০ এপ্রিল, ১৯৭১

মুজিবনগর

১৭ এপ্রিল, ১৯৭১

“যেহেতু সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ হতে ৭ জানুয়ারি ১৯৭১ পর্যন্ত অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল,

যেহেতু, এ সমস্ত নির্বাচনে ১৬৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে বাংলাদেশের জনগণ আওয়ামী লীগের ১৬৭ জনকে নির্বাচিত করেছিলেন, এবং

যেহেতু, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এ সকল প্রতিনিধিকে ৩ মার্চ, ১৯৭১ সালে মিলিত হওয়ার জন্য আহ্বান করেছিলেন, এবং

যেহেতু, উক্ত আহত সভা অনিয়মতান্ত্রিক ও বেআইনিভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিল, এবংযেহেতু, বাংলাদেশের গণপ্রতিনিধিগণের সাথে আলোচনারত থাকাকালে পাকিস্তানের কর্মকর্তাগণ তাঁদের প্রতিজ্ঞা পূরণের পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক অন্যায় যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং যেহেতু, উপরিউক্ত বিশ্বাসঘাতকতা ও অন্যান্য অনুরূপ ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে বাংলার সাড়ে সাত কোটি জনতার অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলার মানুষের ন্যায়সঙ্গত স্বাধিকারের জন্য ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান, এবং

যেহেতু, পাকিস্তানি বর্বরেরা বাংলার নিরীহ জনসাধারণকে নির্বিচারে হত্যা এবং তাদের উপর অমানবিক ও নৃশংস অত্যাচার করেছে এবং এখনও করছে, এবং যেহেতু, পাকিস্তান সরকার বাঙালিদের বিরুদ্ধে অন্যায় যুদ্ধ, গণহত্যা ও অন্যান্য দমনমূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ফলে বাংলাদেশের নির্বাচিত বর্তমান প্রতিনিধিগণ মিলিত হয়ে একটি সংবিধান প্রণয়ন ও সরকার গঠনে অপারগ, এবং

যেহেতু, বাংলাদেশের বীর সন্তানগণ তাদের সাহস, বীরত্ব ও বিপ্লবী চেতনার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর কর্তৃত্ব বজায় রেখেছে।

আমরা যারা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং বাংলাদেশের জনগণ আমাদের উপর যে গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত করেছে তাদের ইচ্ছার প্রতিফলনে আমরা একটি গণপরিষদ গঠন করলাম এবং আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সাম্য, মর্যাদা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তার জন্য বাংলাদেশ সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী এবং বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীন-বাংলাদেশের স্বীকৃতি ঘোষণা করছি এবং যে পর্যন্ত না একটি সংবিধান প্রণয়ন করা হয় সে পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং প্রেসিডেন্ট, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সর্বাধিনায়ক থাকবেন এবং তিনি রাষ্ট্রের সমুদয় নির্বাহী ও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য ক্ষমতাসহ ক্ষমা প্রদানের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী ও প্রয়োজনবোধে অন্যান্য মন্ত্রীকেও নিয়োগ করতে পারবেন। তিনি কর ধার্য ও রাষ্ট্রীয় অর্থ ব্যয় করতে পারবেন, তিনি গণপরিষদ আহ্বান ও মূলতবি ঘোষণা করতে পারবেন, বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি সুন্দর ও সুষ্ঠু সরকার গঠনের প্রয়োজনে তিনি যেকোনো কাজ করতে পারবেন, আমরা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ আরো ঘোষণা করছি যে, প্রেসিডেন্টের অবর্তমানে তথা প্রেসিডেন্ট যখন তাঁর দায়িত্ব গ্রহণে অপারগ অথবা দায়িত্ব পালনে সক্ষম নন, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সমুদয় দায়-দায়িত্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট পালন করবেন।

আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী অন্যান্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আমাদের যে দায়-দায়িত্ব তা পালন করব,
আমরা আরো ঘোষণা করছি যে, স্বাধীনতার এই ঘোষণা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ হতে কার্যকর হবে।
আমরা আরো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করছি যে, আমাদের এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য অধ্যাপক এম. ইউসুফ আলীকে যথাযথভাবে রাষ্ট্রপ্রধান ও উপরাষ্ট্র প্রধানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনার জন্য দায়িত্ব অর্পণ ও নিযুক্ত করলাম।"

স্বাক্ষর
প্রফেসর এম. ইউসুফ আলী
(এম. এন. এ.)

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩৮ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠন

টপিক ৩৮: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

মুক্তিযুদ্ধকে গতিময় ও সুসংহত করা, ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ বাঙালির দেখাশোনা এবং বহির্বিশ্বে বাঙালি জাতির ভাবমূর্তিকে তুলে ধরার জন্য এ সময়ে 'প্রবাসী সরকার' (Government-in-Exile) গঠনের চিন্তা-ভাবনা চলতে থাকে। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত হয় 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ।' অবশেষে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র আদেশ' অনুযায়ী সেদিনই স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' গঠন করা হয়। এ সরকার 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত হয়। এ প্রবাসী সরকার বা 'মুজিবনগর সরকারের' গঠন ছিল নিম্নরূপ :

মুজিবনগর সরকার	
নাম	দায়িত্ব ও পদমর্যাদা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি (পাকিস্তানের কারাগারে আটক)
সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি (বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি এবং পদাধিকারবলে সশস্ত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক)।
তাজউদ্দীন আহমেদ	প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষা, তথ্য ও বেতার, শিক্ষা, স্থানীয় প্রশাসন, স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ, শ্রম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
খন্দকার মোশতাক আহমেদ	পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।
ক্যাপ্টেন (অব.) এম. মনসুর আলী	অর্থ, জাতীয় রাজস্ব, বাণিজ্য, শিল্প ও পরিবহন মন্ত্রণালয়।
এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, জাণ ও পুনর্বাসন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।
কর্নেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানী	সেনাবাহিনী প্রধান (মন্ত্রীর পদমর্যাদা)।
কর্নেল (অব.) এ. রব	সেনাবাহিনীর উপপ্রধান-চীফ অব স্টাফ।

কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর ছিল তখন পাকিস্তানি হানাদারমুক্ত এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দখলে। মেহেরপুরের ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে বহু দেশি-বিদেশি সাংবাদিক, মুক্তিযোদ্ধা এবং আইনসভার সদস্যদের উপস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' (মুজিবনগর সরকার) শপথ গ্রহণ করে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন আইনসভার সদস্য ও প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী। মন্ত্রীদের শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অধ্যাপক মোঃ ইউসুফ আলী ও আব্দুল মান্নান। গার্ড অব অনার প্রদানকারী দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ (PSP)। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করেন মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, এ.আর. আজম চৌধুরী, মুস্তাফিজুর রহমান ও হাফিজ উদ্দিন আহমেদ। এছাড়াও শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ আজাদ, ডা. আসাবুল হক, নূরুল কাদের খান (CSP) ও তৌফিক ইলাহী চৌধুরী (CSP)।

মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রিসভা ও সচিববর্গ

পদ	নাম	একান্ত সচিবের নাম	ভারপ্রাপ্ত সচিবের নাম
রাষ্ট্রপতি	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (পাকিস্তান কারাগারে আটক)	—	—
উপ-রাষ্ট্রপতি (অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি)	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	কাজী লুৎফুল হক	রুহুল কুদ্দুস (সেক্রেটারি জেনারেল)
প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দিন আহমেদ	ড. ফারুক আজিজ খান	তৌফিক ইমাম (ক্যাবিনেট) নুরুল কাদের খান (সংস্থাপন)
মন্ত্রী (প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়)	তাজউদ্দিন আহমেদ	মেজর নুরুল ইসলাম (শিশু) (লিয়াজেঁ অফিসার)	এম.এ. সামাদ
মন্ত্রী (পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী	মাহবুবুল আলম (চাষী) ও আবুল ফতেহ
মন্ত্রী (আইন মন্ত্রণালয়)	খন্দকার মোশতাক আহমেদ	—	এ. হান্নান চৌধুরী
মন্ত্রী (অর্থ-বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়)	মনসুর আলী	সাদত হুসাইন	খন্দকার আসাদুজ্জামান
মন্ত্রী (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	মামুন-উর রশিদ	এ. খালেদ
মন্ত্রী (কৃষি মন্ত্রণালয়)	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	মামুন-উর রশিদ	নুরউদ্দীন আহমেদ
মন্ত্রী (ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়)	এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান	মামুন-উর রশিদ	জয় গোবিন্দ ভৌমিক

মুজিবনগর সরকারের বিশেষ দায়িত্বে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ

বিশেষ দায়িত্ব	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম
তথ্য, বেতার ও প্রচার (স্বাধীন বাংলা বেতার)	আব্দুল মান্নান, এম.এন.এ
সাহায্য ও পুনর্বাসন	অধ্যাপক ইউসুফ আলী, এম.এন.এ
ভলান্টিয়ার কোর	ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, এম.এন.এ
বাণিজ্য বিষয়ক	মতিউর রহমান, এম.এন.এ
বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রধান	বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী
নয়াদিল্লিতে কূটনৈতিক মিশন প্রধান	হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
কলিকাতায় কূটনৈতিক মিশন প্রধান	হোসেন আলী
পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান	ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ	ড. মোশাররফ হোসেন ড. আনিসুজ্জামান ড. খান সারোয়ার মুর্শেদ ড. স্বদেশ রঞ্জন বোস
বাংলাদেশের কৃষক সমিতির প্রধান	ড. এ. আর. মল্লিক
'ইয়ুথ ক্যাম্পের' পরিচালক	উইং কমান্ডার (অব.) এস.আর. মির্জা
পরিচালক, তথ্য ও প্রচার দপ্তর	এম. আর. আখতার মুকুল
পরিচালক, 'চলচ্চিত্র বিভাগ'	আব্দুল জব্বার
পরিচালক, 'আর্টস ও ডিজাইন'	কামরুল হাসান
রিলিফ কমিশনার	শ্রী জে. জি. ভৌমিক
পরিচালক, মেডিকেল বিষয়ক	ডাক্তার টি. হোসেন

মুজিবনগর সরকারের আঞ্চলিক প্রশাসন কাঠামো

প্রশাসনিক অঞ্চল	আঞ্চলিক চেয়ারম্যান	আঞ্চলিক প্রশাসক	আঞ্চলিক সদর দপ্তর
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-১	নূরুল ইসলাম চৌধুরী	এস. এ. সামাদ	সাবরম
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল-২	জহর আহমেদ চৌধুরী	কাজী রকিবউদ্দীন	আগরতলা
পূর্ব অঞ্চল	কর্নেল এম.এ. রব	ডা. কে. এ. হাসান	ধর্ম নগর
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-১	দেওয়ান ফরিদ গাজী	এস. এইচ. চৌধুরী	ডাউকি
উত্তর-পূর্ব অঞ্চল-২	সামছুর রহমান খান	লুৎফর রহমান	তুরা
উত্তর অঞ্চল	মতিউর রহমান	ফয়েজউদ্দীন আহমেদ	কুচবিহার
পশ্চিম অঞ্চল-১	মোঃ আব্দুর রহিম	এম. এ. কাশেম খান	বালুরঘাট
পশ্চিম অঞ্চল-২	আশরাফুল ইসলাম মিয়া	জহরুল ইসলাম ভূঁইয়া	মালদহ
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-১	আব্দুর রউফ চৌধুরী	শামসুল হক	কৃষ্ণনগর
দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল-২	ফণীভূষণ মজুমদার	বি. বি. বিশ্বাস	বনগাঁও
দক্ষিণ অঞ্চল	আব্দুর রব সেরনিয়াবত	এ. মমিন	বারাসত

মুজিবনগর সরকারের জাতিসংঘ প্রতিনিধি দল

মুজিবনগর সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধি দল গঠন করে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়। এই দলের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা হলেন: ফণী ভূষণ মজুমদার, সৈয়দ আব্দুস সুলতান, সিরাজুল হক, ড. মফিজ চৌধুরী, ডা. আসাবুল হক, ফকির শাহাবুদ্দিন আহমেদ, আব্দুস সামাদ আজাদ, এম. আর সিদ্দিকী, ড. এ. আর মল্লিক, অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ, রেহমান সোবহান, আবুল ফতেহ, খুররম খান পল্লী, এম. এ. করিম এবং এ. এম. এ. মুহিত।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৩৯ মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা

টপিক ৩৯: মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হয়েছিল ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদেরকে নিয়ে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল।

১. মুক্তাঞ্চলে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও ট্রেনিং প্রদান: পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন দেশের অভ্যন্তরে ছাত্র যুবকদের উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছিল তখন 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হওয়ায় তারা আশার আলো দেখতে পায়। দলে দলে তারা ভারতে এবং বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে চলে যায়। মুজিবনগর সরকার মুক্তাঞ্চলে এবং বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতীয় এলাকায় 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' স্থাপন করে। এখানে তাদেরকে সামরিক ট্রেনিং দেওয়া হয়। পরবর্তীতে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে ভারতীয় বাহিনী এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের দ্বারা উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

২. মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা: মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে (মুক্তিবাহিনী) কয়েকটি সেক্টরে বিভক্ত করে যুদ্ধ পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেয়। মুক্তিযুদ্ধকে সঠিকভাবে পরিচালিত করা, মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল ঠিক রাখা এবং বিভিন্ন সেক্টর ও গেরিলা বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব মুজিবনগর সরকার নিষ্ঠার সাথে পালন করেছিল।

৩. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রচার: জনগণের মনোবল ঠিক রাখার জন্য এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য 'মুজিবনগর সরকার' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালায়। স্বাধীন বাংলা বেতারের দেশাত্মবোধক গানগুলো এবং 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিল।
৪. বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা: 'মুজিবনগর সরকার' নানা প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও একটি বেসামরিক প্রশাসন গড়ে তুলেছিল।
৫. স্বাধীনতা বিরোধী আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রতিরোধ: মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চালানো হয়েছিল। মুজিবনগর সরকার বিশেষকরে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সুযোগ্য নেতৃত্ব সকল ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দেয়।
৬. বহির্বিশ্বে প্রচার : স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা, লক্ষ্য, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হিংস্রতা ও গণহত্যা, মুক্তিবাহিনীর সাফল্য ইত্যাদি বহির্বিশ্বে প্রচার করে জনমত সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকার প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।

'মুজিবনগর সরকার' মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ছাড়াও বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বহির্বিশ্বের সমর্থন ও জনমত আদায়ের লক্ষ্যে 'মুজিবনগর সরকার' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে 'বিশেষ দূত' নিয়োগ করেন। এ ছাড়াও বাংলাদেশের নাগরিক ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য দেশের সমর্থন আদায়ের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার কারণেই কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের মিশন স্থাপন এবং ঐসব মিশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি নিয়োগ করে প্রবাসী সরকার ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণা ও সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়। প্রবাসী মুজিবনগর সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাইকমিশন বা দূতাবাসের পাকিস্তানি কূটনীতিকদের নিজেদের পক্ষে আনার চেষ্টা করে। মুজিবনগর সরকারের এ পদক্ষেপে অনেকে সাড়া দেন।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানি দূতাবাসের অনেক বাঙালি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। ৬ এপ্রিল দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে. এম. শেহাবুদ্দিন এবং ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তান মিশনের সহকারী হাইকমিশনার হোসেন আলীসহ তাঁর দশজন সহকর্মী পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস স্থাপিত হয় কলকাতায়। এরপরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাকিস্তান মিশনে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাগণ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করেন। ৩০ জুন ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের ইকনোমিক কাউন্সিলার এ. এম. এ মুহিত (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী), ৪ আগস্ট নিউইয়র্কের জাতিসংঘের উপ-

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই বিভিন্ন দেশে পাকিস্তানি দূতাবাসের অনেক বাঙালি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেন। ৬ এপ্রিল দিল্লির পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব কে. এম. শেহাবুদ্দিন এবং ১৮ এপ্রিল কলকাতার পাকিস্তান মিশনের সহকারী হাইকমিশনার হোসেন আলীসহ তাঁর দশজন সহকর্মী পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিদেশে বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস স্থাপিত হয় কলকাতায়। এরপরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাকিস্তান মিশনে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তাগণ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করতে শুরু করেন। ৩০ জুন ওয়াশিংটনে পাকিস্তান দূতাবাসের ইকোনোমিক কাউন্সিলার এ. এম. এ মুহিত (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী), ৪ আগস্ট নিউইয়র্কের জাতিসংঘের উপ-স্থায়ী প্রতিনিধি এম. আনোয়ারুল করিম, ওয়াশিংটন দূতাবাসের মিনিষ্টার এনায়েত করিম, কাউন্সিলর শাহ এ. এম. এস. কিবরিয়া (প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী) সহ ওয়াশিংটনে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাস ও নিউইয়র্কে অবস্থিত জাতিসংঘের সদর দপ্তরে পাকিস্তান মিশনের মোট ১৫ জন বাঙালি কূটনীতিক, ৫ আগস্ট লন্ডনে অবস্থিত পাকিস্তান হাইকমিশনের ডিরেক্টর অব অডিট ও একাউন্টস লুৎফুল মতিন, ম্যানিলায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নীসহ ১৪ জন কূটনীতিক, ১৯ আগস্ট ইরাকের রাষ্ট্রদূত এ.এফ.এম. আবুল ফতেহ,

১৩ সেপ্টেম্বর নাইজেরিয়ায় নিয়োজিত কূটনীতিক মহিউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার, ৪ অক্টোবর নয়াদিল্লি পাকিস্তানি দূতাবাসের হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী (প্রাক্তন মন্ত্রী ও স্পীকার) পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগর সরকারের দক্ষ কূটনৈতিক তৎপরতার কারণে প্রায় ৩৮ জন উচ্চপদস্থ বাঙালি কর্মকর্তা পাকিস্তান দূতাবাস ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন। এসব কূটনীতিকদের পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ এবং বাংলাদেশ মিশনে যোগদান বহির্বিশ্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সমর্থন বৃদ্ধি পায়। বিদেশে মুজিবনগর সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪০ মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত, অনিয়মিত ও আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ

টপিক ৪০: মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত, অনিয়মিত ও আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ঢাকাসহ সারাদেশে বাঙালি নিধনযজ্ঞ শুরু করলে মূলত তখনই শুরু হয় বাঙালি ই.পি.আর, পুলিশ ও ছাত্রজনতার স্বতঃস্ফূর্ত সশস্ত্র প্রতিরোধ। স্বতঃস্ফূর্ত প্রাথমিক প্রতিরোধ চলে ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠন ও ১৭ এপ্রিল সে সরকারের আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণের দিন পর্যন্ত। ১০ এপ্রিল 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' (মুজিবনগর সরকার) গঠিত হলে এ সরকারের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের 'নিয়মিত বাহিনী' গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর ছাড়াও এদেশের ছাত্র যুবকরাও যোগ দিতে থাকে। 'নিয়মিত বাহিনীর' পাশাপাশি 'অনিয়মিত বাহিনী' এবং অনেক এলাকায় 'আঞ্চলিক বাহিনী'ও গড়ে ওঠে। এসব বাহিনী ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ক. মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনী

১৯৭১ সালের ৪ এপ্রিল মেজর শফিউল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন সেনাবাহিনীর হেডকোয়ার্টার তেলিয়াপাড়ায় মিলিত হন কর্নেল (অব.) এম.এ.জি ওসমানী, লে. কর্নেল আব্দুর রব, লে. কর্নেল সালেহ উদ্দিন মোহাম্মদ রেজা, মেজর কাজী নূরুজ্জামান, মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর নূরুল ইসলাম, মেজর শাফায়াত জামিল, মেজর মঈনুল হোসেন চৌধুরী প্রমুখ সিনিয়র মুক্তিযোদ্ধারা। সবাই তখন যে যার মত প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণরত। সেদিন তাঁরা আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন মুক্তিযুদ্ধকে একজন সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তার নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমান্ডের নেতৃত্বে পরিচালনা করতে হবে। সকলে একমত হয়ে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাংগঠনিক নাম বা পরিচয় নির্ধারণ করেন 'মুক্তিবাহিনী' বা 'মুক্তি ফৌজ' (M.F.)। সরকারিভাবে তাদের নাম রাখা হয় 'নিয়মিত বাহিনী'। ১০৪ প্রধান সেনাপতি হিসেবে তারা সকলেই কর্নেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানীকে সাব্যস্ত করেন। ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল আগরতলায় 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' (মুজিবনগর সরকার) গঠিত হয়।

প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ এদিন স্বাধীন বাংলা বেতারে তাঁর ভাষণে মুক্তিবাহিনীর অবকাঠামো গঠনের কথা উল্লেখ করেন। এ ভাষণে তিনি কর্নেল (অব.) এম.এ.জি. ওসমানীকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এবং মেজর শফিউল্লাহ, মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর খালেদ মোশাররফ ও মেজর আবু ওসমান চৌধুরীকে আঞ্চলিক কমান্ডার নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। পরে আরও তিনজন আঞ্চলিক কমান্ডারের নাম উল্লেখ করা হয়। এঁরা হলেন- মেজর নাজমুল হক, ক্যাপ্টেন নওয়াজীশ ও ক্যাপ্টেন জলিল। এসব সেনা কর্মকর্তাকে প্রধান করে যুদ্ধরত সমগ্র বাংলাদেশকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করে 'মুক্তিবাহিনীকে' সংগঠিত করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর

১৯৭১ সালের ১১ থেকে ১৭ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাগণ যুদ্ধের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন ধরনের সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ এবং যুদ্ধের রণকৌশল নির্ধারণের জন্য একটি অধিবেশন বা সম্মেলনে মিলিত হন। ১০৬ তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী সমগ্র বাংলাদেশের রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টর ও সেগুলোকে আবার বিভিন্ন সাব-সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। মুজিবনগর সরকার লে. কর্নেল এম. এ. রবকে চীফ অব স্টাফ এবং গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকারকে ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করে। ১০৭

এক নম্বর সেক্টর: চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং ফেনী নদী পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরে ছিল ২০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৮০০০ জন মুক্তিযোদ্ধা। সেক্টর প্রধান ছিলেন-

ক. মেজর জিয়াউর রহমান (১০ এপ্রিল থেকে ১০ জুন),

খ. মেজর রফিকুল ইসলাম (১০ জুন থেকে ১৬ ডিসেম্বর)।

দুই নম্বর সেক্টর: নোয়াখালী জেলা, কুমিল্লা জেলার আখাউড়া-ভৈরব রেললাইন পর্যন্ত এবং ফরিদপুর জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ছিল ৪০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৩০০০ মুক্তিযোদ্ধা। সেক্টর প্রধান ছিলেন-

ক. মেজর খালেদ মোশাররফ (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর)-নভেম্বর মাসে মেজর খালেদ মোশাররফ গুরুতররূপে আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। নভেম্বরের শেষ নাগাদ সুস্থ হয়ে পুনরায় যুদ্ধে যোগদান করেন। অবশ্য তখন তিনি 'কে' ফোর্সের অধিনায়ক।

খ. মেজর এম. টি. হায়দার (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর)।

তিন নম্বর সেক্টর: সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমা, ঢাকা জেলার অংশবিশেষ, কিশোরগঞ্জ মহকুমা এবং ভৈরব-আখাউড়া রেল পথের পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলার বাকি অংশ নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ছিল ১০,০০০ জন মুক্তিযোদ্ধা।

ক. মেজর কে. এম. শফিউল্লাহ (২৬ এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর),

খ. মেজর নুরুজ্জামান (সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর)।

চার নম্বর সেক্টর: সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, পূর্ব ও উত্তর দিকে সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ৪০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৮০০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

মেজর সি. আর. দত্ত (এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর)।

পাঁচ নম্বর সেক্টর: সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল এবং ডাউকি-ময়মনসিংহ জেলার সীমানা পর্যন্ত এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ১০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৯০০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল।

মেজর মীর শওকত আলী (এপ্রিল থেকে ১৬ ডিসেম্বর)।

ছয় নম্বর সেক্টর: দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁও মহকুমা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাকুল ছাড়া সমগ্র রংপুর জেলা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ১০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ১০০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সেক্টর প্রধান ছিলেন-

উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার।

সাত নম্বর সেক্টর: রাজশাহী, পাবনা, ঠাকুরগাঁও মহকুমা ছাড়া দিনাজপুর এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরাকুল ছাড়া সমগ্র বগুড়া জেলা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ২০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৪২০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সেক্টর প্রধান ছিলেন-

মেজর নাজমুল হক ও মেজর কাজী নূরুজ্জামান। মুক্তিযুদ্ধের সময় সড়ক দুর্ঘটনায় মেজর নাজমুল হক নিহত হলে মেজর কাজী নূরুজ্জামান সেক্টর প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

আট নম্বর সেক্টর: কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ ও খুলনার উত্তরাঞ্চল নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ২০০০ নিয়মিত সৈন্য এবং ৮০০০ মুক্তিযোদ্ধা ছিল। সেক্টর প্রধান ছিলেন-
ক. মেজর আবু ওসমান চৌধুরী (এপ্রিল থেকে আগস্ট),
খ. মেজর এম. এ. মঞ্জুর (জুলাই থেকে ডিসেম্বর)।
নয়নম্বর সেক্টর: খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা নিয়ে গঠিত। সেক্টর প্রধান ছিলেন-মেজর এম. এ. জলিল (জুন থেকে ডিসেম্বর)। মেজর জলিল গ্রেপ্তার হবার পর অস্থায়ীভাবে এ সেক্টরের দায়িত্বভার মেজর জয়নাল আবেদীনের উপর অর্পিত হয়েছিল।
দশ নম্বর সেক্টর: হেড কোয়ার্টারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে এ 'নৌ-কমান্ডো বাহিনী' সংগঠিত হয়। এ সেক্টরের কোনো আঞ্চলিক সীমানা নির্দিষ্ট ছিল না। এ সেক্টর গঠিত হয়েছিল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৫১৫ জন নৌ-কমান্ডো নিয়ে।

এগারো নম্বর সেক্টর: কিশোরগঞ্জ মহকুমা বাদে সমগ্র ময়মনসিংহ জেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের (যমুনা) উভয় তীরবর্তী এলাকা নিয়ে গঠিত। এ সেক্টরের অধীনে ছিল ২৫০০০ মুক্তিযোদ্ধা। সেক্টর প্রধান ছিলেন-

ক. মেজর আবু তাহের (আগস্ট থেকে নভেম্বর),

খ. ফ্লাইট লে. এম. হামিদুল্লাহ (নভেম্বর থেকে ডিসেম্বর)।

(নভেম্বরে মেজর আবু তাহের সমুখযুদ্ধে গুরুত্বরূপে আহত হলে এম. হামিদুল্লাহ সেক্টরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।)

মুক্তিযুদ্ধে 'ব্রিগেড ফোর্স' গঠন

১৯৭১ সালের ১১ জুলাই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করার পাশাপাশি ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈন্যদের নিয়ে তিনটি ব্রিগেড গঠন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১০৮ কিছুদিন পরই ব্রিগেড তিনটি তদানীন্তন তিনজন মেজরের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ব্রিগেডের নামকরণও করা হয় তাঁদের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে। মেজর জিয়াউর রহমানের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে 'Z-Force', মেজর শফিউল্লাহর নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে 'S-Force' এবং মেজর খালেদ মোশাররফের নামের প্রথম অক্ষর দিয়ে 'K-Force' গঠিত হয়। এ তিনটি ব্রিগেডে সংশ্লিষ্টদের পরিচিতি নিম্নরূপ:

ব্রিগেডের নাম	ব্রিগেড প্রধান (যাঁর নামে ব্রিগেডের নামকরণ)	সংশ্লিষ্ট সেনা কর্মকর্তাদের নাম
এস ফোর্স (২য় ইস্ট বেঙ্গল ও ৩নং সেক্টর নিয়ে গঠিত) গঠিত হয় : ১ অক্টোবর, ১৯৭১ হেড কোয়ার্টার : ফটিকছড়া	মেজর শফিউল্লাহ	মেজর মইনুল হাসান চৌধুরী, মেজর আজিজুর রহমান, মেজর মতিয়ার রহমান, মেজর নাসিম, মেজর নূরুল হান্নান, ক্যাপ্টেন সুবিদ আলী ভূঁইয়া, লে. সাঈদ, ক্যাপ্টেন আবুল হোসেন, লে. আমিনুল ইসলাম, লে. বদিউজ্জামান, লে. সেলিম, লে. ইব্রাহিম, লে. নজরুল, লে. নাসের, ফ্লাইট লে. রউফ।
জেড ফোর্স (প্রথম, তৃতীয় ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল সমন্বয়ে গঠিত) হেড কোয়ার্টার : তেলদহ (মাইনকার চরের দু মাইল দূরে) প্রতিষ্ঠা : ৭ জুলাই, ১৯৭১	মেজর জিয়াউর রহমান	মেজর মইনুল হোসেন চৌধুরী (অধিনায়ক- ১ম ইস্ট বেঙ্গল), মেজর জিয়াউদ্দিন (পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন), ক্যাপ্টেন বজলুল গণি পাটোয়ারী, ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন হাফিজ, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম, ফ্লাইট লে. লিয়াকত ওয়াকার। মেজর শাফায়াত জামিল (অধিনায়ক- ৩য় ইস্ট বেঙ্গল), ক্যাপ্টেন মহসিন, ক্যাপ্টেন আনোয়ার, ক্যাপ্টেন আকবর, লে. নূরুন্নাবি, লে. মঞ্জুর, লে. ফজলে হোসেন, ফ্লাইট লে. আশরাফুল আলম। মেজর আমিনুল হক (অধিনায়ক- অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল), ক্যাপ্টেন খালেকুজ্জামান চৌধুরী, লে. মাহবুব, লে. এমদাদ, লে. মুনির, লে. ওয়ালী, লে. বাকের, ক্যাপ্টেন সালাহউদ্দিন মমতাজ (পাকিস্তান থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন এবং শহীদ হন)।

কে ফোর্স (চতুর্থ, নবম ও দশম ইস্ট বেঙ্গল সমন্বয়ে গঠিত) হেড কোয়ার্টার : মেলাঘর প্রতিষ্ঠা : ৭ অক্টোবর, ১৯৭১	মেজর খালেদ মোশাররফ	মেজর মতিন, মেজর হায়দার, মেজর মালেক চৌধুরী, ক্যাপ্টেন আইন উদ্দিন (অধিনায়ক- নবম ইস্ট বেঙ্গল), ক্যাপ্টেন মাহবুব, ক্যাপ্টেন গাফফার (অধিনায়ক- চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল), ক্যাপ্টেন আকবর, ক্যাপ্টেন জাফর ইমাম (অধিনায়ক- ১০ ইস্ট বেঙ্গল), ক্যাপ্টেন শহীদ, লে. হারুন, লে. হুমায়ুন কবীর, লে. দিদার, লে. ইমামুজ্জামান, লে. মিজান, লে. দিদারুল আলম, ক্যাপ্টেন পাশা।

‘এস ফোর্স’ বীরত্বের সাথে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ‘জেড ফোর্স’ কামালপুর, বাহাদুরাবাদ, চিলমারী, গোবিন্দগঞ্জ ও নকশী এলাকায় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ‘কে ফোর্স’ বেলোনিয়া, মন্দাভাগ, শালদা ও কসবা যুদ্ধে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করে।

বিমান বাহিনী (Air Force)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ.কে. খন্দকারকে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চীফ অব স্টাফ নিয়োগ করে। তিনি ছিলেন বিমান বাহিনীর সিনিয়র কর্মকর্তা। তিনি প্রবাসী সরকারের নির্দেশনায় ১৯৭১ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ বিমান বাহিনী' গঠন করেন। ১৮ জন পাইলট এবং ৭০ জন বৈমানিক নিয়ে যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী। ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রদত্ত একটি অটার, একটি অলওয়েট হেলিকপ্টার এবং একটি ডিসি-৩ ডাকোটা বিমান দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী যাত্রা শুরু করে।

পাইলটের মধ্যে ছিলেন স্কোয়াড্রন লিডার সুলতান মাহমুদ, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট বদরুল আলম, ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসুল আলম, ক্যাপ্টেন মালেক (মরহুম), ক্যাপ্টেন শরফুদ্দীন (মরহুম), ক্যাপ্টেন সান্তার, ক্যাপ্টেন মুকিত, ক্যাপ্টেন শাহাব, ক্যাপ্টেন আকরাম এবং এয়ারফোর্সের প্রায় ৭০ জন টেকনিশিয়ান। ৩ ডিসেম্বর রাত দুটোর সময় একই সময়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী চট্টগ্রাম বন্দরের নিকটবর্তী অয়েল ডাম্প এবং নারায়ণগঞ্জের কাছে গোদনাইলে বিমান হামলা চালায় এবং এ হামলা খুবই কার্যকরী হয়েছিল।

এঁরা মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনীকে এয়ার সাপোর্ট দিয়েছিল। বিমান বাহিনীর সদস্য হলেও তাঁরা অনেক সময় স্থলবাহিনীর সদস্যদের পাশে দাঁড়িয়ে ও স্থল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের শেষদিকে, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থান লক্ষ্য করে বড় ধরনের ৪৫টি অভিযান চালায়। এসব অভিযানে পাকিস্তান নৌবাহিনীর ১২৬টি জাহাজ ডুবিয়ে দেয়া হয়। সেপ্টেম্বরের পর চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে বিদেশি কোনো জাহাজ ভিড়তে রাজি হয়নি। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও রসদের সরবরাহ দ্রুত ফুরিয়ে যেতে থাকে”।

বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী (Bangladesh Navy)

১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তান নেভীর অধীনে ফ্রান্সের তুলো নৌঘাটিতে প্রশিক্ষণ শেষে মোঃ রহমতউল্লাহ সি-পিও, মোঃ বদিউল আলম এম.ই-১ সহ মোট ৮ জন সহযোগী সাবমেরিন নৌ-সেনাসহ পালিয়ে এসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এপ্রিল মাসের শুরুতে মুর্শিদাবাদের পলাশীতে বাংলাদেশ ন্যাভাল কমান্ডোদের প্রশিক্ষণদানের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। ১৭৮ জন প্রশিক্ষিত কমান্ডোকে চারটি গ্রুপে বিভক্ত করে চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ এবং মংলা বন্দর ধ্বংসের জন্য পাঠিয়ে দেয়া হয়। এ ১৭৮ জন অকুতোভয় নৌ-কমান্ডো ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে পাঞ্জাবি সেনা, রাজাকার ও স্থানীয় দালালদের চোখ এড়িয়ে অতিকষ্টে শত শত মাইল পায়ে হেঁটে, নৌকায় চেপে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। এরপর তাঁরা সফলভাবে আক্রমণ পরিচালনা করেন। ১৬ আগস্ট স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র এবং বিবিসি থেকে সংবাদ প্রচারিত হয় যে, 'বাংলাদেশের ন্যাভাল কমান্ডোরা আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরে ৬টি জাহাজ ও বার্জ, চাঁদপুরে ১টি জাহাজ (গাজী) ও ১টি পল্টুন, মংলা বন্দরে ৫টি জাহাজ এবং বার্জ, নারায়ণগঞ্জ বন্দরে ৩টি কোস্টার এবং বার্জ এবং দাউদকান্দি ব্রিজ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে। চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা চলাচলকারী গানবোটগুলোর নৌ-পথ বাঙালি কমান্ডোরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছে'। প্রশিক্ষিত নৌ-কমান্ডোদের অনেকেই (মোঃ রহমতউল্লাহ সি-পিও এর নেতৃত্বে) সুন্দরবন এলাকায় প্রায় আট হাজার কিশোর-যুবককে স্বল্পকালীন ট্রেনিং দিয়ে বৃহত্তর খুলনা এলাকায় সমুদ্র ও নৌবন্দরগুলোতে অভিযান চালায়। ৬ অক্টোবর থেকে তারা আক্রমণ শুরু করে এবং ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের অভিযান চলে।

১২ অক্টোবর 'পদ্মা' ও 'পলাশ' দুটি গানবোট সমন্বয়ে 'বাংলাদেশ নৌ-বাহিনী' সংযোজিত হয়। ১৯৭১ সালের ৯ নভেম্বর অকুতোভয় নৌ-কমান্ডোরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিকট থেকে ৬টি নৌযান দখল করে নেয় এবং এগুলো দিয়েই ৯ নভেম্বর 'বঙ্গবন্ধু' নামক নৌবহরের উদ্ধোধন করা হয়। ৬ ডিসেম্বর যশোরের পতনের পর 'পদ্মা' ও 'পলাশ' এবং একটি ভারতীয় গানবোট 'পানভেল' হিরনপয়েন্ট, মংলা বন্দর এবং খুলনার খালিশপুরে পাকিস্তানি নৌঘাঁটি 'পি.এন.এস. তিতুমীর' দখলের জন্য অগ্রসর হয়। ৯ ডিসেম্বর কোনো বাধা ছাড়াই এ গানবোটগুলো হিরনপয়েন্ট পৌঁছায়। পরদিন ১০ ডিসেম্বর অভিযান শুরু হয়। ইঞ্জিন আর্টিফিশার মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমিন (বীরশ্রেষ্ঠ রুহুল আমীন) 'পলাশ'-এর উপরে পাকিস্তানি জাহাজ থেকে ছোঁড়া বোমা বর্ষণে শহীদ হন। "১১১ জনের পর থেকে এভাবেই ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বেশ কয়েকটি সফল নৌ-অভিযান পরিচালনা করে নৌ-কমান্ডোরা।

খ. মুক্তিযুদ্ধের অনিয়মিত বাহিনী

মুক্তিযুদ্ধে নিয়মিত বাহিনীর 'মুক্তিফৌজ' (M.F.) বা 'মুক্তিবাহিনীর' সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল বাংলাদেশের হাজার হাজার ছাত্র, কিশোর, যুবক, কৃষক-শ্রমিকের যুব অংশ। এদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়মিত বাহিনীর অধীনেই মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পাঠানো হতো। প্রথম দিকে নিয়মিত বাহিনীর অধীনে ২/৩ সপ্তাহের সামরিক প্রশিক্ষণ শেষে (মূলত অস্ত্র পরিচালনা বিষয়ে) একজন কমান্ডারের নেতৃত্বে নিজ নিজ এলাকায় গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করার জন্য পাঠানো হতো। এদের কাজ ছিল পাকিস্তানি শত্রু সেনাকে 'আঘাত করে সরে পড়া' (Hit and run)। অনিয়মিত বাহিনীকে সরকারিভাবে বলা হতো 'মুক্তিযোদ্ধা' বা Freedom Fighters (F.F.)। সে সময় গ্রামে-গঞ্জে লোকজন এদেরকে 'গেরিলা বাহিনী' বা 'গেরিলা' বলেও অভিহিত করতো।

গ. আঞ্চলিক বাহিনী

নিয়মিত বাহিনী (Mukhti Fouz সংক্ষেপে M.F.) এবং অনিয়মিত বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাগণের (Freedom fighter = F.F.) পাশাপাশি বিভিন্ন এলাকায় কিছু সাহসী স্বাধীনতাকামী ব্যক্তির নেতৃত্বে দেশের অভ্যন্তরেই বিশেষ বাহিনী গড়ে ওঠে। এসব বাহিনীকে 'আঞ্চলিক বাহিনী' বলা হয়। এঁরা ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে যোগদানকারী স্বল্প প্রশিক্ষিত এবং সরকারি সাহায্য গ্রহণ না নেয়া দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধা। এঁরা পাকিস্তানি সেনাদের সামরিক ছাউনি, বাংকার, চলাফেরার রাস্তায় আচমকা আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে নাজেহাল করতো। এছাড়াও পাকিস্তানি সেনাদের এদেশীয় দালালদের দ্বারা গঠিত রাজাকার বাহিনী ও শান্তি কমিটির সদস্যদের ওপরও এরা আক্রমণ পরিচালনা করতো। প্রয়োজনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গতিবিধিতে বাধা সৃষ্টির জন্য পুল-কালভার্ট তারা ভেঙে দিত, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিত। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানরত স্বাধীনতাকামী মানুষের মনোবল বৃদ্ধি পেত। এসব আঞ্চলিক বাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল প্রায় লক্ষাধিক। এছাড়াও তাদের সাথে ছিল অনেক স্বেচ্ছাসেবক এবং তাদের সংখ্যাও ছিল তিন থেকে চার লক্ষের মতো। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি আঞ্চলিক বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা সংক্ষেপে নিয়ে আলোচনা করা হলো :

১। কাদেরিয়া বাহিনী (Kaderia Bahini) ১১৪ : আঞ্চলিক বাহিনীগুলোর মধ্যে টাঙ্গাইলের কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বাহিনীই সর্বাধিক পরিচিত এবং মুক্তিযুদ্ধের সময়ে সব থেকে বৃহৎ, সবচেয়ে সুসজ্জিত ও সুসংগঠিত এবং রণাঙ্গনে সর্বাপেক্ষা সফল বাহিনী। কাদের সিদ্দিকীর নামেই এ বাহিনী 'কাদেরিয়া বাহিনী' নামে দেশে এবং দেশের বাইরে ব্যাপক পরিচিতি অর্জন করে। কাদের সিদ্দিকী ছিলেন একাত্তরের রণাঙ্গনের এক সাহসী, লড়াকু সৈনিক, এক অতন্দ্র মুক্তিসেনানী। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ও অসম সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য তাঁকে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে জীবিতদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননা 'বীর উত্তম' খেতাব প্রদান করা হয়। এছাড়াও তিনি 'বঙ্গবীর' এবং 'বাঘা কাদের সিদ্দিকী' নামেও জনগণের নিকট সমাদৃত হয়ে ওঠেন। তিনিই একমাত্র বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধা যাঁর সৌভাগ্য হয়েছিল মিত্রবাহিনীর সাথে সর্বপ্রথম ঢাকায় প্রবেশ করা এবং সোহাওয়ার্দী উদ্যানে ১৬ ডিসেম্বর নিয়াজীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার। সমগ্র ময়মনসিংহ-টাঙ্গাইল অঞ্চলে তাঁর বাহিনী পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে আক্রমণের পর আক্রমণ চালিয়ে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং রাজাকার বাহিনীকে পরাজিত করে তাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ কেড়ে নিয়েই তাদের অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছিল।

২. হেমায়েত বাহিনী (Hemayet Bahini) : দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের হাবিলদার হেমায়েত উদ্দিন ১৯৭১ সালের মে মাসে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার বাটরাবাজারে ২৯ মে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর নামানুসারে এ বাহিনী 'হেমায়েত বাহিনী' নামে পরিচিতি অর্জন করে। হেমায়েত উদ্দিনের নেতৃত্বে এ বাহিনী ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুন মাসের মধ্যেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখল থেকে মুক্ত করে। তাঁর বাহিনীতে প্রায় পাঁচ হাজারের (৫০৫৪) অধিক সাহসী তরুণ-যুবক সমবেত হয়েছিল। এদের মধ্যে নিয়মিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্য ছিলেন ৩৪০ জন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং রাজাকারদেরকে আক্রমণ করে হারিয়ে দিয়ে বা মেরে ফেলে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অস্ত্র দিয়েই গড়ে তোলা হয়েছিল হেমায়েত বাহিনীর অস্ত্র ভাণ্ডার। তবে অস্ত্রের থেকেও তাদের বড় যুদ্ধাস্ত্র ছিল দেশপ্রেম এবং জনগণের ভালোবাসা।

৩. আফসার বাহিনী (Afsar Bahini) : মেজর আফছার উদ্দিন নামে এক সাহসী ও দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তা একটিমাত্র রাইফেল নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা থানার মল্লিক বাড়ি রাঁজি গ্রামে একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন এবং নিজেই তাদেরকে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তার বাহিনীতে প্রায় সাড়ে চার হাজারের অধিক যোদ্ধার সমাবেশ ঘটে। এ বাহিনীরও অস্ত্রশস্ত্রের প্রধান উৎস ছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালাল রাজাকারদের যুদ্ধে পরাজিত করে বা তাদেরকে মেরে ফেলে কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র।

মেজর আফছার-এর পৃষ্ঠপোষকতায় এবং আফছার ব্যাটালিয়নের তরফ থেকে সাপ্তাহিক 'জাগ্রত বাংলা' পত্রিকায় প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ মুক্তিকামী জনগণের মনে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আফছার বাহিনী রোগাক্রান্ত ও আহত মুক্তিযোদ্ধা এবং বিপর্যস্ত মানুষের চিকিৎসার জন্য ১৩ জন ডাক্তার ও ৩ জন নার্স সমন্বয়ে একটি ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল স্থাপন করেছিল। আফছার বাহিনীকে ২৫টি কোম্পানিতে (৫টি ব্যাটালিয়নে) বিভক্ত করা হয়েছিল। প্রত্যেক কোম্পানিতে ৩টি প্লাটুন, প্রত্যেক প্লাটুনে ৩টি সেকশন এবং প্রত্যেক সেকশনে ১৫ জন করে মুক্তিসেনা ছিল। ময়মনসিংহ সদর (দক্ষিণ) ও ঢাকা সদর (উত্তর) সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে আফছার ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়েছিল। বাটাজুর, কাচিন, ডাকাতিয়া, পাঁচগাঁও, কাওলামারী, রাঁজি, ফুলবাড়িয়া, আমিরাবাড়ি, নারাজী, বড়ইদ, দক্ষিণ ফুলবাড়িয়া ও কালিয়াকৈর এলাকায় আফছার বাহিনী মুক্তিযুদ্ধে সুরণীয় ভূমিকা পালন করেছিল।

৪. আকবর বাহিনী (Akbar Bahini) : আকবর হোসেন মিয়ার নেতৃত্বে মাগুরা-শ্রীপুর এলাকায় একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসর রাজাকার সদস্যদের যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই এ বাহিনী তাদের অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলে। মাগুরা-শ্রীপুর অনেক এলাকা তাঁদের অতন্দ্র গ্রহণের কারণেই পাকিস্তানি সেনাদের দখলমুক্ত ছিল। বেশ কটি যুদ্ধে তাঁরা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে।

৫. বাতেন বাহিনী (Baten Bahini): টাঙ্গাইল এলাকায় কাদেরিয়া বাহিনীর পাশাপাশি জনৈক আব্দুল বাতেন নামক এক সাহসী ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। এ বাহিনী 'বাতেন বাহিনী' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এ বাহিনী গেরিলা পদ্ধতিতে যুদ্ধ করে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও রাজাকারদেরকে বিভিন্ন রণাঙ্গনে নাস্তানাবুদ ও কোণঠাসা করে রাখে।

৬. হালিম বাহিনী (Halim Bahini): মানিকগঞ্জ জেলার একটি এলাকায় জনৈক আব্দুল হালিম নামক দেশপ্রেমিক ও সাহসী ব্যক্তির নেতৃত্বে একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। এ বাহিনীও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ও রাজাকারদের কাছ থেকে কেড়ে নেয়া অস্ত্র দিয়ে তাদের অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলে। এ বাহিনীর তৎপরতার কারণেই মানিকগঞ্জের বেশ কিছু এলাকা পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ন্ত্রণ ও দখলমুক্ত ছিল।

৭. জিয়া বাহিনী (Zia Bahini): সাহসী জিয়াউদ্দীন-এর নেতৃত্বে সুন্দরবন এলাকায় একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। জিয়া বাহিনীর তৎপরতার কারণেই সুন্দরবন এলাকা ছিল পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ন্ত্রণ ও দখলমুক্ত।
৮. রফিক মীর্জা বাহিনী (Rafiq Mirza Bahini): রফিক মীর্জা নামক এক সাহসী যুবকের নেতৃত্বে একটি বাহিনী গড়ে ওঠে। এ বাহিনী সিরাজগঞ্জ-পাবনার একটি বিস্তীর্ণ এলাকা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখলমুক্ত রাখতে পেরেছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে তাঁরা বেশ কয়েকটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।

ঢাকায় গেরিলা অপারেশন (মায়া ব্রাক প্লাটুন) ১১৯ : ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা ঢাকায় এসে কয়েকটি সফল আক্রমণ পরিচালনা করে। এর ফলে বহির্বিশ্বের মানুষ জানতে পারেন যে, মুক্তিযোদ্ধারা শুধু সীমান্তেই যুদ্ধ করছে না, তাঁরা ঢাকা শহরে প্রবেশ করেও সফল গেরিলা হামলা চালিয়ে মুক্ত এলাকায় আবার ফিরে গিয়েছে। এতে মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবলও বৃদ্ধি পায়। ২নং সেক্টরের কমান্ডার মেজর খালেদ মোশাররফ ও ক্যাপ্টেন হায়দার ১৬ জনের একটি 'সুইসাইড স্কোয়াড' গঠন করে ঢাকায় পাঠান। এ দলে ছিলেন মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া), এ. মাসুদ (চুন্সু), উলফদ বদি, কাজী স্বপন, বাদল, জিয়া, আলম প্রমুখ। এ দলটি ৬ জুন ঢাকা শহরে প্রবেশ করে। তাঁরা ৯ জুন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ঢুকে গ্রেনেড হামলা চালায়। সেখানে সামরিক জাস্তা একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিল। এরপর তাঁরা রমনা থানার কাছে শান্তি কমিটির সদস্য এক জামায়াত নেতার বাসায় অনুষ্ঠিত দলীয় সম্মেলনে গ্রেনেড হামলা চালায়।

১৯৭১ সালের আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এ. মাসুদ চুন্সু, গাজী দস্তগীর, জিয়া, আনু, সামাদ, আলম, বুলু ও টুলু ফার্মগেটে একটি পাকিস্তানি সেনা ক্যাম্পের ওপর সফল আক্রমণ চালায়। এতে ১ জন পাকিস্তানি অফিসার ও ১৭ জন পাকিস্তানি সেনা প্রাণ হারায়। মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী (মায়া), গাজী দস্তগীর ও আব্দুস সামাদ-এ তিন জন কমলাপুর রেল স্টেশনেও সফল গ্রেনেড হামলা চালায়। নাসির উদ্দিন বাচ্চু, শাহাবুদ্দীন (চিত্র শিল্পী), শাহাদাত চৌধুরী, মোঃ জহিরুল হক প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধা এবং তাঁদের নেতৃত্বে ঢাকায় সফল গেরিলা অপারেশন চালানো হয়েছিলো।

মুজিব বাহিনী বা বি.এল.এফ (Mujib Bahini or B.L.F) : ১৯৭১ সালের নিয়মিত ও অনিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের শেষ দিকে আর একটি বাহিনীর আবির্ভাব ঘটে। এটি 'মুজিব বাহিনী' নামে পরিচিত হয়। এ বাহিনীর ট্রেনিং, যুদ্ধ অভিযান ইত্যাদি সরকার তথা নিয়মিত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। মুজিব বাহিনী গঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের নির্দিষ্টভাবে বাছাই করা কিছু তরুণ ও যুবককে নিয়ে। ধারণা করা হয় যে, মুক্তিযুদ্ধ যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে তা যেন কোনো উগ্র বা চরমপন্থি গ্রুপ বা দলের হাতে চলে না যায়, সেজন্যই আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসীদের নিয়ে এরূপ একটি মুক্তিযোদ্ধা বাহিনী গঠন করার পরিকল্পনা করা হয়। ১৯৭১ সালের মে মাসে অত্যন্ত গোপনে 'মুজিব বাহিনী' গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। জুন থেকে অক্টোবর-নভেম্বর পর্যন্ত জেনারেল উবানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে মুজিব বাহিনীর সদস্যদের ট্রেনিং দেয়া হয় জাফলং ও দেরাদুনে। মুজিব বাহিনীর প্রধান ছিলেন সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪১ চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ও পাকিস্তানি
সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

টপিক ৪১: চূড়ান্ত বিজয় অর্জন ও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	কখ গঘ

১৯৭১ সালের ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ ও ভারত সরকার মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ বাহিনী বা 'যৌথকমান্ড' গঠন করলে নাটকীয়ভাবে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বদলে যায়। ভারতের ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে 'যৌথ কমান্ডের' অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়। যৌথ কমান্ডের প্রধান হন ভারতের সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শ্যাম মানেকশ'। ২১ নভেম্বর বয়রা এলাকায় পাকিস্তান বাহিনীর সাথে যৌথবাহিনীর যুদ্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৩টি ট্যাঙ্ক ও ৩টি স্যাবর জেট বিমান ধ্বংস হয়। পাকিস্তান সরকার ২৩ নভেম্বর সারাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে। মুক্তিযোদ্ধা এবং মিত্রবাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হতে থাকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী। পাকিস্তান এ সময় কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা মুক্তিযুদ্ধকে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পরিণত করে বিশ্ববাসীকে ধোঁকা দিতে চেয়েছিল। এজন্য ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তান অতর্কিতে ভারতের বিমানঘাঁটি অমৃতসর, পাঠানকোট, আগ্রা ও শ্রীনগরের উপর বিমান হামলা চালায়। বাংলাদেশের অকুতোভয় বিমান সেনারা এদিন রাতেই চট্টগ্রামস্থ ইস্টার্ন রিফাইনারি ডিপো এবং নারায়ণগঞ্জের গোদনাইলস্থ জ্বালানি ডিপোতে সফল বিমান আক্রমণ চালায়। ভারতীয় জঙ্গি বিমান যৌথ বাহিনীকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান শুরু করে। শুরু হয় জল-স্থল ও আকাশ পথে পাকিস্তানি সেনা অবস্থানের উপর যৌথ বাহিনীর ঝাঁড়াশি আক্রমণ।

৫ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবকটি বিমান যৌথ বাহিনীর আক্রমণে বিশেষ করে ভারতীয় বিমান বাহিনীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে যায়। বলা যায় এদিন থেকে বাংলাদেশের আকাশ শত্রুমুক্ত হয়। এদিন ১২ ঘণ্টায় ভারতীয় বিমান বাহিনী ২৩২ বার বিমান অভিযানে ঢাকার তেজগাঁও এবং কুর্মিটোলা বিমান বন্দরে ৫০ টনের মতো বোমা নিক্ষেপ করে। এ দুটি বিমান ঘাঁটিতে রানওয়েতে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয় এবং বিমান ঘাঁটি চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। পাকিস্তান বাহিনীর ৯০টি গাড়ি, সেনা বোঝাই কয়েকটি লঞ্চ ও স্টিমারও ভারতীয় বিমান হামলায় সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে যায়। নৌবাহিনীর যৌথ কমান্ড চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দরে নোঙর করা নিরপেক্ষ বিদেশি জাহাজগুলোকে বন্দর ত্যাগের আহ্বান জানায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র থেকে ধারে পাওয়া পাকিস্তানের সাবমেরিন 'গাজী' যৌথ কমান্ডের সফল আক্রমণে বঙ্গোপসাগরে ধ্বংস হয়ে গেলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মনোবল আরো ভেঙে পড়ে। এছাড়া বাংলাদেশের সকল রণাঙ্গন থেকেই যৌথবাহিনীর আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয়ের সংবাদ জেনারেল নিয়াজীসহ সকল সামরিক কর্মকর্তাকে উদ্দিগ্ন করে তোলে।

৬ ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে আরো একটি কারণে স্মরণীয় দিন। এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এর ফলে পাকিস্তানি সেনাদের মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

৭ ডিসেম্বর খুলনা-যশোর-কুষ্টিয়া অঞ্চলের সবকটি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পরাজিত হতে থাকে। এসব এলাকার পাকিস্তানি সেনাদের শেষ আশাটুকুও নিভে যায় এদিন যশোর ক্যান্টনমেন্টের পতনের ফলে। পাকিস্তানি সেনারা যশোর ক্যান্টনমেন্ট এবং সীমান্তবর্তী এলাকাগুলো থেকে তাদের ট্যাংক, কামান এবং ট্রাক-জিপ, অন্যান্য যানবাহন ও যুদ্ধ সরঞ্জাম নিয়ে খুলনায় পালিয়ে যায়। এদিন মিত্র বাহিনীর ছত্রী সেনারা সিলেটের শালুটিকর বিমান বন্দরে অবতরণ করে। একই সাথে চতুর্দিক থেকে মিত্র বাহিনী সিলেটের পাকিস্তানি সেনাঘাঁটিগুলোর উপর আক্রমণ চালিয়ে বিধ্বস্ত করে ফেলে। দুপুরের মধ্যেই সিলেট এলাকার পাকিস্তানি সেনা অধিনায়ক তাঁর অধীনস্থ সেনাদের নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

৮ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট চারদিক থেকে অবরোধ করে ফেলে। ফলে তারা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বের হয়ে ঢাকা বা চট্টগ্রাম কোনো দিকেই পালাতে পারছিল না। ভারতীয় সেনাপ্রধান তথা 'যৌথ কমান্ডের' প্রধান জেনারেল ম্যাকেনকশ' পাকিস্তানি সেনাদেরকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। তিনি পাকিস্তানি সেনাদের আশ্বস্ত করে জানান যে, আত্মসমর্পণ করলে 'জেনেভা কনভেনশনের' নীতি অনুযায়ী তাঁদের প্রতি সম্মানজনক আচরণ করা হবে।

৯ ডিসেম্বর যৌথবাহিনী ঢাকার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। বাংলাদেশের সকল রণাঙ্গন থেকে যৌথবাহিনীর বিজয় ও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদপসারণের সংবাদ আসতে থাকে।

১০ ডিসেম্বর বিদেশিদের সরিয়ে নেয়ার বা দেশত্যাগের সুযোগ দেয়ার জন্য বিমান আক্রমণ বন্ধ রাখা হয়। এদিন ঢাকার কাছাকাছি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বড় অবস্থান ভৈরব শহর যৌথবাহিনীর দখলে আসে। ১১ ডিসেম্বর জামালপুর, ময়মনসিংহ, হিলি, গাইবান্ধা, ফুলছড়ি, বাহাদুরাবাদ পাকিস্তানি সেনাদের কবলমুক্ত করে যৌথবাহিনী। এদিন গভর্নর এ.এম. মালিক ও তাঁর মন্ত্রিপরিষদ সদস্যগণ প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে পদত্যাগ করেন এবং হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া সম্পূর্ণরূপে পাকিস্তানি শত্রু সেনাদের দখলমুক্ত হয়। ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশিরা তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানে কলকাতায় চলে যান। এদিন নব উদ্যমে মিত্রবাহিনীর বিমানগুলো ঢাকার পাকিস্তানি সেনা অবস্থানগুলোর উপর মুহূর্মুহ বিমান হামলা চালাতে থাকে।

১৩ ডিসেম্বর টাঙ্গাইল পাকিস্তানি সেনাদের দখলমুক্ত হয়। মিত্র বাহিনী দ্রুত বেগে ঢাকা শহরের দিকে এগিয়ে আসতে থাকে। এদিনও ঢাকায় অবস্থিত পাকিস্তানি সেনা অবস্থান লক্ষ্য করে মিত্র বাহিনীর বিমানগুলো সারাদিন বোমা বর্ষণ চালিয়ে যেতে থাকে।

জেনারেল নিয়াজী ও অন্যান্য পাকিস্তানি ঊর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তারা মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। তারা ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট সেনা ও অন্যান্য সাহায্য চেয়ে বারবার নিষ্ফল আবেদন জানাতে থাকেন। ইয়াহিয়া খান এবং পাকিস্তানি জেনারেলরা তখনও শেষ চেষ্টা চালিয়ে যান মার্কিন সপ্তম নৌবহর যেন এসে বাংলাদেশে অবরুদ্ধ পাকিস্তানি সেনাদের মুক্ত করেন। কিন্তু বিধি বাম। মার্কিন সপ্তম নৌবহর পাকিস্তানি সেনাদেরকে রক্ষা বা উদ্ধার করার জন্য আসেনি। ১৩ ডিসেম্বর 'এক দিকে চলছে কামানে-বিমানে তীব্র আক্রমণ, আর একদিকে বেতারে প্রচারিত হচ্ছে আত্মসমর্পণের আবেদন। জেনারেল মানেকশ' বলেন: 'আমার সৈন্যরা এখন ঢাকাকে ঘিরে ধরেছে এবং ঢাকার সেনানিবাস কামানের গোলার পাল্লার মধ্যে। সুতরাং আপনারা আত্মসমর্পণ করুন। আত্মসমর্পণ না করলে নিশ্চিত মৃত্যু। যারা আত্মসমর্পণ করবে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে এবং তাদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা হবে'।

১৪ ডিসেম্বর মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাঙালি দোসর আলবদর ও আলশামস নামক দুটি ঘাতক বাহিনী এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান শিক্ষক-চিকিৎসক-লেখক-সাহিত্যিক-দেশপ্রেমিক-বুদ্ধিজীবীদের ধরে এনে নির্যাতন শেষে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করতে শুরু করে। তারা চেয়েছিল বাংলাদেশ স্বাধীন হলেও যেন মেধাশূন্য হয়ে পড়ে। জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী এদিন সব আশা ছেড়ে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কয়েকটি দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে আত্মসমর্পণের বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে থাকেন। এদিন ঢাকা শহরের মাত্র ১৫ কিলোমিটারের মধ্যে এসে পৌঁছায় যৌথবাহিনী। ১৪ ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক ও বাঙালি গভর্নর ডা. মালেক তাঁর মন্ত্রিসভা ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ পদত্যাগ করে রেডক্রসের নিয়ন্ত্রণাধীন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১২১ উপায়ান্তর না দেখে ১৫ ডিসেম্বর লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীসহ বাংলাদেশে যুদ্ধরত উর্ধ্বতন পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা মিত্রবাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তা মিত্রবাহিনীকে জানিয়ে দেয়। ১৫ ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস মারফত লে. জেনারেল নিয়াজী প্রস্তাব পাঠান যে, তিনি শর্তসাপেক্ষে আত্মসমর্পণ করতে চান। তাঁর দেয়া প্রধান শর্ত হলো 'পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সবাইকে নিজ দেশে চলে যাওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং কাউকে গ্রেপ্তার করা চলবে না।'

ভারত সরকার এবং সেনাবাহিনী তাৎক্ষণিক সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে জানায় যে, 'বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তবে আত্মসমর্পণ করলে যুদ্ধবন্দীরা জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ব্যবহার পাবে'। দিল্লির মার্কিন দূতাবাস মারফত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনাধ্যক্ষ লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজীকে জানিয়ে দেয়া হয় : 'আমাদের প্রস্তাব ভেবে দেখার জন্য আপনাকে ১৬ তারিখ সকাল ৯টা পর্যন্ত সময় দেয়া হলো। ভারতীয় বিমান বাহিনী ঐ সময় পর্যন্ত কোনো আক্রমণ করবে না। কিন্তু সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী যথারীতি অগ্রসর হতে থাকবে। যদি সকাল ৯টার মধ্যে আত্মসমর্পণের খবর না পাই তাহলে তখন থেকে আবার বিমান বাহিনীর আক্রমণ পুরোদমে শুরু হবে'। ঢাকার ভিতরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। জেনারেল মানেকশ' তাঁর শেষ বার্তায় পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে জানান 'সকাল নয়টার মধ্যে বেতারে জানাতে হবে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করছেন কিনা'। একটা বেতার ফ্রিকোয়েন্সিও বলে দেন।

১৬ ডিসেম্বর সকাল দশটায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৪ ডিভিশনের কমান্ডার মেজর জেনারেল জামশেদ ঢাকার মিরপুর ব্রিজের কাছে অপেক্ষমাণ ভারতীয় মেজর জেনারেল গন্ধব নাগরার কাছে আত্মসমর্পণ করেন। ভারতীয় মিত্রবাহিনী ও বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী সকাল ১০.৪০ মিনিটে ঢাকা নগরীতে প্রবেশ করেন বীরের বেশে, মাথা উঁচু করে। মেজর জেনারেল নাগরা ও কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী ঢাকায় প্রবেশ করার কয়েক মিনিটের মধ্যেই ভারতীয় লে. জেনারেল জ্যাকব হেলিকপ্টারে ঢাকায় পৌঁছান। জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানান। আত্মসমর্পণের দলিল তৈরি হয়। বিকেল ৪টা নাগাদ সদলবলে ঢাকা পৌঁছান মিত্রবাহিনীর পূর্বাঞ্চল প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। ১২৩ এদিন বিকেল ৪.২১ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী প্রায় ৯৩ হাজার সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্রসহ ঢাকার রমনার রেসকোর্স বা ঘোড়দৌড় ময়দানে (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন জোনের তথা যৌথ বাহিনীর প্রধান লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

আত্মসমর্পণের দলিলটি ছিল নিম্নরূপ (অনূদিত) :

পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড পূর্ব রণক্ষেত্রে ভারতীয় এবং বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে. জেনারেল অরোরার কাছে আত্মসমর্পণে সম্মতি প্রদান করেছেন। এ আত্মসমর্পণে বাংলাদেশে অবস্থানরত পাকবাহিনীর স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্য, সকল আধাসামরিক এবং অসামরিক অস্ত্রধারী সৈনিক অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এ সকল সৈন্যরা যে যেখানে যেভাবে আছেন সেভাবে অস্ত্র পরিত্যাগ করবেন এবং তাদের নিকটস্থ জেনারেল অরোরার অধীনস্থ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করবেন। এ দলিল স্বাক্ষরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড জেনারেল অরোরার আদেশাধীনে ন্যস্ত হবে। তাঁর আদেশের বরখেলাপ আত্মসমর্পণ চুক্তি ভঙ্গের সামিল হবে এবং যুদ্ধের সর্বগ্রাহ্য নিয়মাবলি ও বিধি অনুযায়ী অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ আত্মসমর্পণ চুক্তির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত কোনো সন্দেহের উদ্ভব হলে লে. জেনারেল অরোরা এ মর্মে পবিত্র আশ্বাস প্রদান করেন যে, যাঁরা আত্মসমর্পণ করবে তাদের প্রতি জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী যোগ্য সম্মান ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া হবে। লে. জেনারেল অরোরার অধীনে সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিদেশি নাগরিক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বেসামরিক নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা হবে।

স্বাক্ষর
জগজিৎ সিং অরোরা
লে. জেনারেল
জি ও সি এবং পূর্বাঞ্চলীয় ভারতীয়
বাহিনী ও বাংলাদেশ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক
১৬.১২.১৯৭১

স্বাক্ষর
আমির আবদুল্লা খান নিয়াজী
লে. জেনারেল
সামরিক আইন প্রশাসক, জোন-বি এবং
পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চল কমান্ডের সর্বাধিনায়ক
১৬.১২.১৯৭১

আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন পরাজিত সেনানায়ক লে. জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী এবং বিজয়ী সেনানায়ক লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা। মুক্তিবাহিনীর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ. কে. খন্দকার এবং মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম বীর নায়ক কাদের সিদ্দিকী (বাঘা সিদ্দিকী)।

পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সাথে সাথে সারাদেশে এবং বিশেষ করে ঢাকা শহরে উৎসবের জোয়ার বয়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর জন্য কমপক্ষে ১০ লাখ নারী-পুরুষ-শিশু-যুবা-বৃদ্ধ রাজপথে নেমে আসেন। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সুদীর্ঘ ৯ মাসের অত্যাচার-নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি লাভের আনন্দে তারা ছিলেন উদ্বেলিত। এ কারণেই বিজয়ী সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের অভিনন্দন ছিল পুরোপুরিভাবে স্বতঃস্ফূর্ত। এভাবে দীর্ঘ নয় মাসের যুদ্ধের পর বাংলাদেশ শত্রুমুক্ত হয়। পৃথিবীর মানচিত্রে উদ্ভিত হয় স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ'। ১৬ ডিসেম্বর বাঙালির জাতীয় জীবনে তাই তাৎপর্যময় দিন। বাঙালি জাতি এদিন প্রায় অস্ত্র-শস্ত্রহীন, নিঃস্ব অবস্থায়, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, সীমাহীন রক্তপাত ও ত্যাগের মাধ্যমে সর্বোপরি বিশ্ব জনমত ও বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের সহায়তায় মাত্র নয় মাসের মধ্যে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীন দেশ ও জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪২ মুক্তিযুদ্ধে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

টপিক ৪২: মুক্তিযুদ্ধে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিদেশি প্রচার মাধ্যমগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ ও গণহত্যা শুরু করলে কোনো বিদেশি সাংবাদিক যেনো এ সংবাদ দেশের বাইরে পাঠাতে না পারে সেজন্য পাকিস্তান সরকার তাদেরকে ঢাকাস্থ ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের বাইরে যেতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর মধ্যেও দুজন সাংবাদিক লুকিয়ে ঢাকা শহরের ধ্বংসযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করেন। পরবর্তীতে তাঁদের পরিবেশিত সংবাদ পড়ে সারা বিশ্ব পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক ও নারকীয় ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে জানতে পারেন। বিশ্ববিবেক বাঙালি জনগণের সমর্থনে জাগ্রত হতে থাকে। পশ্চিমা বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন না করলেও সেসব রাষ্ট্রের গণমাধ্যমগুলো বাঙালি জনগণের পাশে এসে দাঁড়ায়। তাঁদের পরিবেশিত সংবাদ মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করে। নিম্নে বিদেশি প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো:

ব্রিটিশ প্রচার মাধ্যম

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ব্রিটিশ সরকার অত্যন্ত সতর্ক ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করে। তবে তাদের নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতির কারণে এবং প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা থাকায় সেদেশের পত্রপত্রিকা ও বি.বি.সি.তে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঠিক তথ্য পরিবেশিত হতে থাকে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী 'অপারেশন সার্চ লাইট' নামক গণহত্যা শুরুর আগেই বিদেশি সাংবাদিকদের বন্দী করে করাচিতে পাঠিয়ে দেয়-যাতে ২৫ মার্চ থেকে ঢাকা এবং আশপাশ অঞ্চলে যে নির্বিচার গণহত্যা চালানো হয় তার কোনো খবর বহির্বিশ্বে প্রচার না পায়। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনজন বিদেশি সাংবাদিক ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ছাদে লুকিয়ে থাকেন-তারা হলেন- আরনল্ড জেটলিন, মাইকেল লরেন্ট এবং সাইমন ড্রিং। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই ৬ মার্চ লন্ডনভিত্তিক সংবাদপত্র 'ডেইলি টেলিগ্রাফ'-এর সাংবাদিক সাইমন ড্রিং ঢাকায় আসেন। ২৫ মার্চ কালরাতে তিনি ছিলেন ঢাকায়। তাঁর বয়স তখন সবে ২৬ বছর। পরে অবশ্য সাইমন ড্রিংকে ঢাকা ছেড়ে ব্যাঙ্ককে পাড়ি জমাতে হয়। ব্যাঙ্ক থেকে তিনি তাঁর গণহত্যার বিবরণ ছাপার জন্য সংবাদপত্র অফিসে পাঠান।

তাঁর পাঠানো এবং Daily Telegraph-এর ৩০ মার্চ সংবাদের শিরোনাম ছিল: 'ট্যাংক দিয়ে পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমন করা হচ্ছে: ৭০০০ নিহত, ঘরবাড়ি ভস্মীভূত'। এতে বলা হয়- 'আল্লাহ এবং পাকিস্তানের ঐক্যের নামে' ঢাকা আজ বিধ্বস্ত ও সন্ত্রস্ত নগরী। দীর্ঘ ২৪ ঘণ্টার নৃশংস অভিযান, ঠাণ্ডা মাথায় বোমাবর্ষণ এবং গোলাগুলি চালিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কমপক্ষে সাত হাজার মানুষকে হত্যা করেছে। তারা বিশাল এলাকা মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে-যাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার স্পৃহা শুরুতেই স্তব্ধ হয়ে যায়। শহর থেকে হাজার হাজার মানুষ প্রাণভয়ে গ্রামের দিকে ছুটে পালাচ্ছে। শহরের রাস্তাঘাটগুলো প্রায় জনশূন্য হয়ে পড়েছে এবং প্রদেশটির নানা জায়গা থেকে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ডের খবর আসছে'।

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ 'The Time'-এর ফটো সাংবাদিক মাইকেল লরেন্ট সংবাদ পরিবেশন করে বলেন যে, ২৫ ও ২৬ মার্চ দুই রাতে ঢাকাতে কমপক্ষে সাত হাজার মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। 'গার্ডিয়ান' ৩১ মার্চ 'A Massacre in Pakistan' শিরোনামে খবর প্রকাশ করে। 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ২ এপ্রিল খবর শিরোনাম করে 'Bengal Tragedy'। 'নিউ স্টেটসম্যান' ২ এপ্রিল হেড লাইন করে: 'Weep for Bengal'। ৩ এপ্রিল 'ইকনমিস্ট' পত্রিকায় শিরোনাম হয় 'Unity at gunpoint'। 'টেলিগ্রাফ' ৪ এপ্রিল শিরোনাম করে 'Pakistan's path to Bloodshed'। একই দিন গার্ডিয়ানের শিরোনাম ছিল 'A cry for help'। মে মাসের ১৯ তারিখ পিটার হ্যাজেলহাস্ট সংবাদ শিরোনাম করে- 'Road of Death' নামে। ১২৯ এভাবে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহ বিশ্ববাসীর সামনে প্রচার করতে থাকে। জুন মাসের ১৩ ও ২০ তারিখে 'Sunday Times' পত্রিকার পাকিস্তান সংবাদদাতা অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস লিখিত 'Genocide' শিরোনামে পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ফিচার ছাপানো হয়। বিশ্ববাসী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতায় হতবাক ও মর্মান্বিত হয়। সারা বিশ্বে এ রিপোর্টটি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র, রেডিও-টিভিতে তা প্রচারিত হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাজ্যের বিশ্বখ্যাত সংবাদ মাধ্যম বি.বি.সি. অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলাদেশের মানুষ বি.বি.সি. পরিবেশিত সংবাদকে নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বাসযোগ্য মনে করতো।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রচার মাধ্যম

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঘোর বিরোধী ছিল। নিরস্ত্র সরকার সরাসরি পাকিস্তানি সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন ও সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করেছিল।

তবে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্র, বিশেষ করে 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'ক্রিস্টিয়ান সায়েন্স মনিটর' প্রভৃতি বাংলাদেশের ঘটনাবলি 'সম্পর্কে সংবাদ পরিবেশন করে। 'নিউইয়র্ক টাইমস' লিখেছিল যে, 'এ গৃহযুদ্ধ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার হলেও তা গেরিলা যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহ করলে বিপজ্জনক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। এ পরিস্থিতিতে বিশ্ব-রাষ্ট্রগুলোর উচিত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে এ মর্মে আহ্বান জানানো, যেন মানবতা ও শুভবুদ্ধির ভিত্তিতে তিনি রক্তপাত বন্ধ করেন এবং জনগণের নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দেন'। 'ওয়াশিংটন পোস্ট'-এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃশংস কার্যকলাপ ও গণহত্যার জন্য প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে দায়ী করে।

ভারতের সংবাদ মাধ্যম

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ২৫ মার্চের পর কীভাবে অত্যাচারিত-নিপীড়িত বাঙালি জনগণ দলে দলে ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তার সচিত্র প্রতিবেদন ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতো। ভারতের মাটিতে আশ্রয় নেয়ার পূর্বে কীভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের দোসর রাজাকার ও শান্তিবাহিনীর সদস্যরা পলায়নরত বাঙালি জনগণের ওপর অত্যাচার চালাতো, কীভাবে সবকিছু লুটপাট করে নিত, কীভাবে কিশোরী ও যুবতী মেয়েদেরকে ধরে নিয়ে যেত-তা প্রায় প্রতিদিন ছাপা হতো ভারতীয় সংবাদপত্রে। মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবস্থানের ওপর গেরিলা কায়দায় অপারেশন চালাতো-সে সংবাদও পরিবেশন করতো ভারতীয় সংবাদপত্র। এর ফলে যুদ্ধরত বাঙালি জনগণ এসব সংবাদ পাঠে দেশের স্বাধীনতায় আরো উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠতো, দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য 'প্রশিক্ষণ শিবিরে' অংশগ্রহণ করতো। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি স্বচক্ষে বাংলাদেশের শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা দেখার জন্য ভারতে এলে-সেদেশের সাংবাদিকরা তাঁকে সঙ্গে দেন এবং বাঙালি জনগণের সর্বস্ব হারানোর মর্মন্তুদ ঘটনাসমূহ তাঁর সামনে তুলে ধরেন।

১০ এপ্রিল 'মুজিবনগর সরকার' গঠিত হলে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এ সরকারকে জোর কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য আহ্বান জানায়। ১৩০ 'অমৃতবাজার পত্রিকা' ছাড়াও যুগান্তর, দৈনিক বসুমতি, মুসলমান, সাপ্তাহিক গৌরব প্রভৃতি পত্রিকাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সংবাদ পরিবেশন এবং সম্পাদকীয়, উপ-সম্পাদকীয় ও ফিচার লিখে সহযোগিতা করে। ভারতীয় সংবাদপত্রের এসব সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, সংবাদ প্রতিবেদন এবং আকাশবাণী কলকাতার প্রতিদিনের পরিবেশিত সংবাদ ও সংবাদ-বিশ্লেষণ ১৯৭১ সালে যুদ্ধরত বাঙালি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

জাপানি প্রচার মাধ্যম

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে জাপানের প্রচার মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ এবং ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। ১৯৭১ সালের মার্চের প্রথম থেকেই অসহযোগ আন্দোলনের সংবাদ জাপানের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। এর ফলে বহির্বিশ্ব বাঙালি জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে এবং প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দমননীতির বীভৎসতা ও নির্মমতা সম্পর্কে অবগত হয়। 'দি জাপান টাইমস' সহ অনেক জাপানি পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন, ফিচার, সম্পাদকীয় লিখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের (সোভিয়েত রাশিয়ার) প্রচার মাধ্যম
সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারের মতোই সোভিয়েত প্রচার মাধ্যমও বাংলাদেশের অসহযোগ
আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে নিয়মিত সংবাদ পরিবেশন করে। সোভিয়েত 'দৈনিক প্রভদা',
'New Times', বার্তাসংস্থা 'তাস' মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান
সরকারের পাগলামো এবং উন্মাদনার বিরুদ্ধে 'প্রভদা' কঠোরভাবে ইঁশিয়ারিও প্রদান করে।
১৩১ সোভিয়েত বার্তা সংস্থা 'তাস' ১৯৭১ সালের ১ অক্টোবর তাদের নিজস্ব এক সংবাদ
প্রতিবেদনে গণহত্যা, ধ্বংস, নির্যাতন ও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টির জন্য পাকিস্তান সরকারের
কঠোর সমালোচনা করে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪৩ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

টপিক ৪৩: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাত বারোটোর পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ধরা পড়ার পূর্বেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর রেকর্ডকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাটি চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের কাছে পাঠিয়ে দেন। ১৩৪ ২৬ মার্চ সকাল ৯টায় চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রের কর্মীরা সামরিক সরকারের নির্দেশাবলি প্রচার বন্ধ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে কার্যক্রম শুরু করার প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

চট্টগ্রাম বেতারের লেখক, ঘোষক ও শিল্পী বেলাল মোহাম্মদ এ বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণের জন্য চলে যান চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সমাজকর্মী, সংগঠক ও মহিলা মাসিক 'বান্ধবী' সম্পাদক বেগম মুশতারী শফীর বাসভবনে। কালুরঘাটস্থ চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাটি চালু করা যায় কিনা সে সম্পর্কে গোপন সলাপরামর্শের পর বেলাল মোহাম্মদ তাঁর সাথীদের নিয়ে কাজ শুরু করেন। চট্টগ্রামে ই.পি.আর-এর কমান্ডার ক্যাপ্টেন রফিকুল ইসলাম কালুর ঘাট বেতার কেন্দ্র পাহারার জন্য বেলাল মোহাম্মদকে আশ্বস্ত করেন। দুপুর ২টা ০৫ মিনিটে চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব এম.এ. হান্নান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র (আগ্রাবাদ) থেকে সর্বপ্রথম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। ১৩৫ কিন্তু আগ্রাবাদে অবস্থিত বেতার কেন্দ্র চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙ্গর করা পাকিস্তান যুদ্ধ জাহাজের শেলিং আওতার মধ্যে থাকায় এটি কালুরঘাটস্থ ট্রান্সমিটিং সেন্টারে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২৬ মার্চ সন্ধ্যা ৭-৪০ মিনিটে চট্টগ্রাম বেতারের কালুরঘাট প্রচার ভবন থেকে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু করা হয়। 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' নাম ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণাটি বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দীপ, আব্দুল্লাহ আল ফারুক ও সুলতানুল আলমের কন্ঠে বারবার প্রচার করা হয়। এ উদ্বোধনী অধিবেশনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এম.এ. হান্নান এবং প্রবীণ কবি আব্দুস সালাম স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন এবং জনগণকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের উদাত্ত আহ্বান জানান। ২৭ মার্চ বেলাল মোহাম্মদ ও অন্যরা জানতে পারেন যে, চট্টগ্রাম বন্দরে পাকিস্তানি যুদ্ধ জাহাজ থেকে ২৫ মার্চ অস্ত্র খালাস করতে গিয়ে পশ্চিমঘে ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ক্রাকডাউনের সংবাদ শুনে মেজর জিয়াউর রহমান তাঁর অধীনস্থ বাঙালি সেনাদের নিয়ে পটিয়ায় অবস্থান করছেন। বেলাল মোহাম্মদ ও অন্যরা ২৭ মার্চ পটিয়ায় গিয়ে মেজর জিয়াউর রহমানকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্রের নিরাপত্তা গ্রহণের অনুরোধ জানালে তিনি ১৫০ জন সৈন্যকে পাঠিয়ে দেন। তিনি নিজেও পটিয়ার অস্থায়ী ছাউনি ত্যাগ করে কালুরঘাটে পৌঁছান। ২৭ মার্চ কালুরঘাট স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারকেন্দ্রে বারবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা বেতারকর্মীদের কন্ঠে প্রচারিত হচ্ছিলো। কালুরঘাটসহ প্রচার ভবনের অফিস কক্ষে বেলাল মোহাম্মদ মেজর জিয়াউর রহমানকে একান্তে জিজ্ঞেস করেন "আচ্ছা, মেজর সাহেব, এখানে তো আমরা সবাই 'মাইনর' আপনিই একমাত্র 'মেজর'।

আপনি কি নিজের কণ্ঠে কিছু প্রচার করবেন?” মেজর জিয়াউর রহমান বেলাল মোহাম্মদের সাথে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাৎক্ষণিক সেখানে ঐ মুহূর্তেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজিতে স্বাধীনতার একটি ঘোষণা লিপিও তৈরি করেন। ২৭ মার্চ সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিটে মেজর জিয়াউর রহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন। ১৩৬ এরপর ২৮ এবং ৩০ মার্চ তারিখে মেজর জিয়াউর রহমান আবারও কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর স্বপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ দুপুর ২.৩০ মিনিটে পাকিস্তান বিমান বাহিনী কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র লক্ষ্য করে বোমাবর্ষণ শুরু করলে এর কার্যক্রম স্থগিত করে মুক্তিযোদ্ধারা কৌশলগত কারণে এ কেন্দ্রের একটি ১ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার ও অন্যান্য মূল্যবান যন্ত্রাংশ রামগড় হয়ে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে স্থানান্তর করে। ১৯৭১ সালের ৩ এপ্রিল ত্রিপুরা রাজ্যের বাগাফায় একটি শর্টওয়েভ ট্রান্সমিটারের সাহায্যে আবার শুরু করা হয় এর কার্যক্রম। বেলাল মোহাম্মদের প্রচেষ্টায় এ বেতার কেন্দ্রটি শালবাগান ও বাগাফা হয়ে বেলুনিয়া ফরেস্ট হিলস রোডে স্থানান্তর এবং কার্যক্ষম করা হয়। স্বাধীন বাংলা বেতারে প্রচারিত কার্যক্রম মুক্তিকামী বাঙালিদের মনোবলকে আবারো চাঙ্গা করে তোলে।

১৯৭১ সালের ২৫ মে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরের কার্যক্রম শুরু করা হয়। ইতোমধ্যে ঢাকা ও অন্যান্য বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা কলকাতায় এবং মুজিবনগরে এসে উপস্থিত হন। তাঁদেরকে একত্রিত ও সংঘবদ্ধ করে পরদিন ২৬ মে থেকে শুরু করা হয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম। স্বাধীন বাংলা বেতারের জাতীয় সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান, সংবাদ বুলেটিন এবং 'জল্লাদের দরবার' ও 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় অনুষ্ঠান। এসব অনুষ্ঠান যুদ্ধে লিপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে ও আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণরত এবং দেশের অভ্যন্তরে আটকে পড়া বাঙালি জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে আরো উদ্দীপ্ত করে তোলে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'জল্লাদের দরবার' অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে 'কেল্লা ফতেহ খান' নামক একজন অমানবিক, পাশবিক ও নিষ্ঠুর চরিত্রের মানুষ হিসেবে তুলে ধরা হয়। আর একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রাম ছিল 'চরমপত্র'। এ সিরিজটির পরিকল্পনা ছিল আব্দুল মান্নান খান এম.এন.এ.-র এবং এর স্ক্রিপ্ট তৈরি ও তা পাঠ করতেন এম.আর আখতার মুকুল। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক শব্দে এবং ঢাকাইয়া ভাষায় রচিত চরমপত্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এম.আর মুকুলের অনবদ্য উপস্থাপনায়।

এ অনুষ্ঠানটি শোনার জন্য শুধু বাংলাদেশের মুক্তিপাগল মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণই নয়, পশ্চিম বাংলা, ত্রিপুরা রাজ্য এবং আসামের বাঙালি জনগণও সারাদিন উদ্গ্রীব হয়ে থাকতেন। মুক্তিযোদ্ধাদের সফল অভিযানগুলো এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকারদের পরাজয়ের কথা যখন তিনি সরস ঢাকাইয়া কথ্য ভাষায় উপস্থাপন করতেন তখন ব্যাংকারে বসে থাকা মুক্তিযোদ্ধাদের মনে তা' আবেগের সৃষ্টি করতো, তাঁরা সংকল্পবদ্ধ হতেন পাকিস্তানি সেনাদের ঘায়েল করে এদেশের পবিত্র মাটিকে শত্রুমুক্ত করার জন্য। 'জাগরণী' নামের দেশাত্মবোধক গানের অনুষ্ঠানও মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী সাধারণ মানুষকে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য উৎসাহিত, উদ্বেলিত করে তুলতো। এছাড়াও মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ছিল বিশেষ অনুষ্ঠান 'অগ্নিশিখা', 'রণভেরী' ও 'রণঙ্গনের সংবাদ' (বিশেষ সংবাদ বুলেটিন), দর্পণ (বিশেষ কথিকা) প্রভৃতি। এছাড়াও বিশেষ পর্যালোচনা অনুষ্ঠান 'দৃষ্টিপাত', 'ইসলামের দৃষ্টিতে' ইত্যাদি অনুষ্ঠান প্রচার করে পাকিস্তানের অপপ্রচারের জবাব দেয়ার পাশাপাশি মুক্তিকামী বাঙালি জনগণের মনোবল চাঙ্গা করে রাখা হতো। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল 'প্রতিনিধির কণ্ঠ'। এতে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, অর্থমন্ত্রী এম. মনসুর আলী, মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আতাউল গণি ওসমানীসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া বিভিন্ন সময়ের ভাষণ প্রচার করা হতো।

১৯৭৫ সালের ২৫ মার্চ যখন ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশ পাকিস্তানি সেনাদের পাশবিক আক্রমণে দিশেহারা ও শোকাকুল, সমগ্র দেশ যখন পাকিস্তানি সেনারা পুড়ে ছারখার করছে, মা-বোনরা লাঞ্চিত ও ধর্ষিত হচ্ছে তখন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রই ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করে। মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও জেনারেল ওসমানির ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে দেশপ্রেম সৃষ্টিকারী 'জল্লাদের দরবার' ও 'চরমপত্রের' মত অসংখ্য অনুষ্ঠানে প্রচার করে 'মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট' হিসেবে যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল, জাতি তা চিরকাল শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪৪ মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা

টপিক ৪৪: মুক্তিযুদ্ধে ছাত্র, নারী ও সাধারণ মানুষের ভূমিকা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে ঢাকাসহ সারাদেশে অগ্নিসংযোগ, গুলিবর্ষণ, গণহত্যা শুরু করলে এবং মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করলে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তিযুদ্ধের ঘোষণা চট্টগ্রাম থেকে প্রচারিত হলে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, আনসার, মুজাহিদ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও ছাত্র-জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ শুরু হয়ে যায়। ১০ থেকে ১৭ মার্চের মধ্যে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার' বা 'মুজিবনগর সরকার' গঠন ও শপথ গ্রহণের কাজ সম্পন্ন হলে এ সরকারের নেতৃত্বে শুরু হয় সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ। এ মুক্তিযুদ্ধে বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও ই.পি.আর-পুলিশের পাশাপাশি ছাত্র-জনতা এমনকি নারীরাও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাদের সে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকাই সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

ছাত্রদের ভূমিকা (Role of Students)

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯৪৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সব ধরনের আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রসমাজের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। ১৯৪৮-৫২ সালে সংঘটিত ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের ভূমিকাই ছিল মুখ্য। ভাষা আন্দোলনের ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। ১৯৬৯ সালে ছাত্রসমাজ ১১ দফা প্রণয়ন করে জনগণকে সম্পৃক্ত করে যে গণআন্দোলন গড়ে তোলে তার ফলে আইয়ুব-মোনায়েম খানের স্বৈরাচারী শাসনের পতন ঘটে। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় ডাকসুর সহ-সভাপতি আ.স.ম. আব্দুর রব ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কুদ্দুস মাখন এবং ছাত্রলীগ সভাপতি নূরে আলম সিদ্দিকী ও সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান সিরাজ-এ চার ছাত্রনেতা 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। ২ মার্চ তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সমাবেশে বাংলাদেশের মানচিত্রখচিত পতাকা উত্তোলন করেন। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানের বিক্ষোভসমাবেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে (প্রধান অতিথি) তাঁরা ৫ দফাভিত্তিক 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা করেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে ছাত্রসমাজ ঢাকাসহ সারাদেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ শুরু করে। পাকিস্তানি সেনাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রের মুখে ছাত্রসমাজের সে প্রতিরোধ ভেঙে গেলেও তারা দমে যায়নি। ২৫ মার্চের কালরাতে পাকিস্তানি হানাদারবাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকে জহুরুল হল, জগন্নাথ হল, রোকেয়া হলসহ অন্যান্য হল ও শিক্ষকদের আবাসস্থলে গিয়ে হামলা চালায়। অসংখ্য ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী সেদিন প্রাণ হারায়। সারাদেশেই ছাত্রসমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পাকিস্তানি হানাদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট, ই.পি.আর, পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে ছাত্রসমাজ তাদের পাশে দাঁড়ায়। EBR এবং EPR-এর নিকট থেকে স্থানীয়ভাবে সামান্য কয়েকদিনের ট্রেনিং নিয়ে ছাত্ররা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করে। এরপর ছাত্ররা দলে দলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলাদেশের মুক্ত এলাকাগুলোতে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে শুরু করে।

প্রশিক্ষণ শেষে তারা বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে থেকে পাকিস্তানি হানাদারদের কবল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ শুরু করে। স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রায় দশ মাস সময়কালে বিভিন্ন সেক্টরের অধীনে থেকে – অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও সাহসের সাথে সামান্য কয়েকদিনের ট্রেনিং এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে শুধুমাত্র গ্রেনেড ও সেকেলে থ্রি নট থ্রি রাইফেল দিয়ে নিজেদের জীবনবাজি রেখে তারা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ তাদেরকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল আমেরিকা ও চীনের তৈরি আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত সে সময়ের পৃথিবীর অন্যতম সামরিক শক্তিধর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে।

নারীর ভূমিকা (The Role of Women): বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নারী ও যুবসমাজ। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনারা আমাদের মা বোনদের ইজ্জত লুণ্ঠন করেছে। আনুমানিক প্রায় ৬ লক্ষ নারী ধর্ষিত হয়েছে। ১৩৭ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানি হানাদার সেনারা মেয়েদেরকে তুলে এনে তাদের ক্যাম্পে ধর্ষণসহ অমানবিক নির্যাতন চালাতো। রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনী পাকিস্তানি সেনাদের এ কাজে সহযোগিতা করতো। ১৯৭১ সালে নারীরা যেমন নির্যাতিত হয়েছে, তেমনি মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তারা পুরুষের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও পালন করেছে। মুক্তিযুদ্ধে তাদের সে ভূমিকা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. সশস্ত্র যোদ্ধা হিসেবে: মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কলকাতার 'গোবরা ক্যাম্পে' প্রায় ৪০০ জন মহিলা মুক্তিযোদ্ধা সশস্ত্র যুদ্ধের ট্রেনিং গ্রহণ করেন। এছাড়াও আগরতলায় 'লেম্বুচোরা ক্যাম্পে' মহিলা গেরিলা স্কোয়াড গঠন করে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের উপর উচ্চতর ট্রেনিং দেয়া হয়। ১৩৮ অনেক মহিলা বা নারী সরাসরি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন।
২. যুদ্ধক্ষেত্রে সহযোগী যোদ্ধা হিসেবে: ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এমন কিছু মহিলা ছিলেন যাদের কোনো অস্ত্র পরিচালনার ট্রেনিং না থাকলেও যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট গোলাবারুদ পৌঁছে দেয়া, বাংকারে খাবার পৌঁছে দেয়া, অস্ত্র পরিষ্কার করে দেয়া, ফাইফরমাশ খেটে দেয়া প্রভৃতি কাজ করেছেন।

৩. মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয়দাত্রী ও অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষকরূপে: ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধারা গেরিলা কৌশল অবলম্বন করে সারা দেশের গ্রামগঞ্জে ছড়িয়ে ছিলেন। গ্রাম বাংলার গৃহবধূরা মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আশ্রয় দেয়। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে তাঁরা অনেক সময় মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিজের শোবার ঘরে, বাথরুমে বা গোলাঘরে লুকিয়ে রেখে, কখনো কখনো মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বামী বা নিকট-আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে ঘাতক রাজাকার, আলবদর ও পাকিস্তানি সেনাদের হাত থেকে রক্ষা করেন। অনেক সময় তাঁরা নিজেরা এবং পরিবারের সদস্যরা অভুক্ত থেকেও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে খাবার জুগিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় অস্ত্র সংরক্ষণের দায়িত্বও মহিলারা পালন করেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশস্ত্র তাঁরা অতিযত্নে চাউলের ড্রামে, মুরগির খোয়াড়ে, বিছানার নিচে, মাটির তলায়, বাথরুমে বা আলমারিতে লুকিয়ে রাখতেন।

৪. সেবা শুশ্রূষাকারিণীরূপে: অসুস্থ কিংবা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের নার্সিং-এর দায়িত্ব নারীরাই পালন করতেন। সীমান্ত অঞ্চলে কিংবা মুক্তাঞ্চলে যে সকল অস্থায়ী হাসপাতাল চালু করা হয়েছিল সেখানে নারীরাই সেবার কাজ করতেন।

৫. তথ্য আদান-প্রদান কাজে নারী: ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় তথ্যের আদান-প্রদানের মতো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে অনেক সাহসী নারী গোপনে লিফলেট, পত্রিকা ইত্যাদি ছাপানো এবং এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছানোর কাজে পুরুষের পাশাপাশি অংশ নিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বুদ্ধিজীবীদের চিঠিপত্র এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেয়ার কাজেও নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এমনকি অনেক নারী যৌনকর্মী রাজাকার ও পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছ থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে মুক্তিযোদ্ধাদের নিকট পৌঁছে দিতেন।

৬. জনমত গঠনে নারীর ভূমিকা: মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক স্বাধীনতাকামী দেশি-বিদেশি নারী ও নারী সংগঠন সভা সমাবেশ করে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে জনমত সংগঠন করতে থাকে। মিসেস নুরজাহান মোর্শেদ এম.এন.এ, বেগম বদরুন্নেসা আহমেদ এম.এন.এ, মিসেস রাফিয়া আখতার ডলি এম.এন.এ, রাজনৈতিক নেত্রী মিসেস মতিয়া চৌধুরী, মালেকা বেগম, আয়েশা খানম, চট্টগ্রামের মুশতারী শফী, পাবনার শিরিন বানু মিতিল, সুনামগঞ্জের দীপালী চক্রবর্তী, নেত্রকোনার রেখা সাহা প্রমুখ মুক্তিযুদ্ধের প্রচার আন্দোলনে অংশ নেন। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে নারীসমাজকে সংগঠিত করে তোলেন।

৭. অনুপ্রেরণাদানকারীরূপে: মুক্তিযুদ্ধে অনেক মা স্বেচ্ছায় তার ছেলেকে, বোন তার ভাইকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়েছেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এবং শরীফ ইমাম তাঁদের বড় ছেলে রুমীকে মুক্তিযুদ্ধে পাঠিয়ে তাকে দেশের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। জাহানারা ইমামের মতো অসংখ্য মা ছিলেন যাঁরা তাঁদের ছেলেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলেন। বাঙালি জাতি চিরকাল জাহানারা ইমামসহ শহীদদের মাকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে।

সাধারণ জনগণের ভূমিকা (The Role of General/Mass People): ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল 'জনযুদ্ধ' (Peoples War)। মুক্তিযুদ্ধ ছিল এ দেশের গণমানুষের সমর্থনে, গণমানুষের দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-নির্ধন, নারী-পুরুষ, সব বয়সের, সব পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে যাঁর যতটুকু সম্ভব ভূমিকা পালন করেছেন। সামান্য কিছু কুলাঙ্গার রাজাকার, আলবদর ব্যতীত ১৯৭১ সালে সাড়ে সাত কোটি আমজনতা, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এ মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শরীক হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে প্রশিক্ষিত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজারের মতো। এর মধ্যে সেনাবাহিনীর (EBR) সংখ্যা ছিল ছয় হাজার, প্যারামিলিশিয়া বাহিনীর (EPR) সংখ্যা ছিল এগারো হাজার, পুলিশ-আনসার দশ হাজার। এক লক্ষ বিশ হাজারের মধ্যে এ সাতাইশ হাজার বাদ দিলে আর বাদবাকি তিরানব্বই হাজার ছিল 'জনযোদ্ধা'। এ জনযোদ্ধারা ছিল কৃষক এবং ছাত্র। ছাত্ররা বেশিরভাগই ছিল মধ্যবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত কৃষকেরই সন্তান। ঐ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের এক চতুর্থাংশই ছিল জনযোদ্ধা এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কৃষকের সন্তান।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন নয় মাসে গ্রামে গ্রামে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কৃষকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধার পিতা বা ভাই হবার কারণে হত্যা করেছে। মা-বোনদের ইজ্জতহানি করেছে। পাকিস্তানি সেনাদের নির্যাতনের ভয়ে ছাত্র ও যুবক শ্রেণি পালিয়ে গিয়ে মুক্তাঞ্চলে বা ভারতের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবিরে অস্ত্র চালনায় শিক্ষা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিশ্লেষণ করলে একথা মানতেই হবে যে, এ মুক্তিযুদ্ধে সব শ্রেণি-পেশার, সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ যোগদান করেছে। এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই একটি গণযুদ্ধ বা জনযুদ্ধ। পৃথিবীর আর কোনো স্বাধীনতা যুদ্ধে এভাবে সব মতপথের মানুষ, সব বয়সের মানুষ, নারী-পুরুষ, সব ধর্ম-বর্ণের মানুষ হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেনি।

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪৫ বুদ্ধিজীবী হত্যা

টপিক ৪৫: বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড

This Topic is important for



MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সাধারণ অর্থে জ্ঞান, বিদ্যা-বুদ্ধি ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে উচ্চতর বা অগ্রসর শ্রেণিকেই 'বুদ্ধিজীবী' বলা হয়। লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, গবেষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকেই বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণ্য করা হয়। বুদ্ধিজীবীরা বিশ্বের সব দেশেই 'আলোর সন্ধানী', 'সমাজের বিবেক', 'আত্মার কারিগর', 'মানুষ গড়ার কারিগর' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত হয়ে থাকেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ষাটের দশকের শিক্ষা আন্দোলন, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ৬-দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণআন্দোলন, ১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের লেখনী ও বক্তব্য বাঙালি জনগণকে অধিকার সচেতন ও আত্মসচেতন করে তোলে। পাকিস্তানের খুনি প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে যখন বাঙালি জনগণকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার আদেশ দিয়ে ঢাকা ছেড়ে পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যান তখন পাকিস্তানি বর্বর সেনাবাহিনী প্রথমেই আঘাত হানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষকবৃন্দের ওপর, ছাত্রদের ওপর এবং দেশের আলোকিত মানুষদের উপর। ২৫ মার্চ রাত ১১টার পর থেকে পরের দিন ২৬ মার্চ, এমনকি পরবর্তী মাসগুলোতেও পর্যায়ক্রমে এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাঙালি জাতির চূড়ান্ত বিজয়ের উষালগ্ন পর্যন্ত প্রগতিশীল ও মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের বেছে বেছে হত্যা করা হয় নির্মম-নিষ্ঠুরভাবে।

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ডিসেম্বর ভোরবেলা পর্যন্ত পাকিস্তানের খুনি মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে 'আল বদর' ও 'আল শামস' নামক ঘাতক বাহিনীর সদস্যরা বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্মম ও নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন করে অবশেষে হত্যা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ও যশস্বী শিক্ষক-গবেষক, প্রখ্যাত চিকিৎসক, লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদেরকে সুপরিকল্পিতভাবে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে। বুদ্ধিজীবী হত্যা স্পষ্টতই ছিল সামরিক জান্তার নীলনকশার বাস্তবায়ন, যে নীলনকশার লক্ষ্য ছিল বুদ্ধিজীবীদের নিশ্চিহ্ন করে বাঙালি জাতিকে নেতৃত্বহীন এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়ায় পরিণত করা।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজীর সার্বিক নির্দেশনায় এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর তত্ত্বাবধানে বুদ্ধিজীবী হত্যার নীলনকশা বাস্তবায়নে নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার বশির, লেফটেন্যান্ট কর্নেল হেজাজী, মেজর জহুর, মেজর আসলাম, ক্যাপ্টেন নাসের ও ক্যাপ্টেন কাইউম। চরম ডানপন্থি, আধাসামরিক আল বদর ও আল শামস বাহিনীর সশস্ত্র ক্যাডাররা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অস্ত্র সজ্জিত হয়ে এ বর্বরোচিত ও অমানবিক হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। 'আল বদর বাহিনীর' ঘাতকরা ছিল জামায়াতে ইসলামীর তৎকালীন অঙ্গ ছাত্র সংগঠন 'ইসলামী ছাত্র সংঘের' সদস্য এবং 'আল শামস বাহিনীর' ঘাতকরা ছিল মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও উর্দুভাষী বিহারীদের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনী। আলবদর ও আলশামস নামক ঘাতকবাহিনী কর্তৃক বুদ্ধিজীবীদের পরিকল্পিত হত্যাযজ্ঞ ১০ ডিসেম্বর থেকে ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে ঢাকায় ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে। ১৪ ডিসেম্বর রাতে ঢাকায় দুই শতেরও বেশি বুদ্ধিজীবীকে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নেওয়া হয়। ঢাকায় এ হত্যাযজ্ঞ শুরু হয় এবং ক্রমে ক্রমে তা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে, বিশেষত জেলা ও মহকুমা শহরে সম্প্রসারিত হয়।

আল বদর ও আল-শামস বাহিনীর ঘাতক বা হত্যাকারীরা চিহ্নিত বুদ্ধিজীবীদের তাদের নিজ নিজ বাড়ি থেকে গেস্টাপো কায়দায় তুলে নিয়ে কালো কাপড়ে চোখ বেঁধে কোনো বিশেষ নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যেত। এসব নির্যাতন কেন্দ্র ছিল ঢাকার মিরপুর, নাখাল পাড়া, রাজারবাগ, মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার এবং শহরের আরো বেশকিছু এলাকায়। আল বদর, আল শামস বাহিনীর সদস্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শহরে জারিকৃত কার্যের সুযোগে বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যেতো। এরপর এসব হতভাগ্য লেখক-সাহিত্যিক, শিক্ষক, চিকিৎসক, বুদ্ধিজীবীদের উপর চলত নির্মম দৈহিক নির্যাতন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেয়নেটের আঘাতে তাদের দেহ ক্ষত-বিক্ষত করে হত্যা করা হতো। ঢাকা শহরে প্রধান প্রধান বধ্যভূমি ছিল রায়ের বাজার, আলেকদি, কালাপানি, রাইনখোলা, মিরপুর বাংলা কলেজের পশ্চাডাগ, হরিরামপুর প্রভৃতি স্থান।

১৪ ডিসেম্বরের পর মোহাম্মদপুর থানার পূর্বপ্রান্ত ও রায়ের বাজার ইটখোলা, মিরপুরের শিয়ালবাড়ি, বিভিন্ন জলাভূমি, ডোবানালা, নিচু জমি ও ইটের পাঁজার মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের বহুসংখ্যক মৃতদেহ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। লাশ দেখে মৃতের স্বজনরা কান্নায় ভেঙে পড়ে। কালো কাপড়ে চোখ বাঁধা এবং পেছনে হাত বাঁধা অবস্থায় ক্ষত-বিক্ষত এ লাশগুলোর অধিকাংশেরই দেহ ফুলে উঠেছিল। তাদের বুকে, মাথায় ও পিঠে ছিল বুলেটের আঘাত এবং সারাদেহে বেয়নেটের ক্ষত চিহ্ন। ১৫০ তবে অনেক শহীদ বুদ্ধিজীবীর লাশ পাওয়া যায়নি। ঘাতক দালালরা এসব লাশ গুম করে ফেলেছিল এমনভাবে যে তাদের স্বজনেরা তা উদ্ধার করতে পারেনি।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় এবং তাঁদের প্রকৃত সংখ্যা অদ্যাবধি নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ, শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিকট আত্মীয়দের স্মৃতিচারণ, সাংবাদিক ও লেখক-গবেষকদের লেখনী থেকে পাওয়া সূত্র থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এসব প্রাপ্ত তথ্যসূত্র থেকে শহীদদের যে তালিকা পাওয়া যায় এর মধ্যে ছিলেন ৯৯১ জন শিক্ষাবিদ, ১৩ জন সাংবাদিক, ৪৯ জন চিকিৎসক, ৪২ জন আইনজীবী, ৯ জন সাহিত্যিক ও শিল্পী, ৫ জন প্রকৌশলী এবং অন্যান্য ২ জন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখানোর জন্য সরকার ১৪ ডিসেম্বর 'শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস' ঘোষণা করেছে। সমগ্র জাতি বিনম্র শ্রদ্ধায় দিবসটি পালন করে থাকে।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা (জেলাভিত্তিক)^{১৫২}

জেলা	শিক্ষাবিদ	সাংবাদিক	আইনজীবী	চিকিৎসক	সাহিত্যিক ও শিল্পী	প্রকৌশলী	অন্যান্য	মোট
ঢাকা	৭৩	১১	৬	৪৬	৯	৩	১	১৪৯
ফরিদপুর	৪৩	—	২	—	—	—	—	৪৫
টাঙ্গাইল	২৯	—	—	—	—	—	১	৩০
ময়মনসিংহ	৭৫	—	২	—	—	—	—	৭৭
চট্টগ্রাম	৬২	—	১	—	—	১	—	৬৪
পার্বত্য চট্টগ্রাম	১৪	—	১	—	—	—	—	১৫
সিলেট	২৬	—	২	—	—	—	—	২৮
কুমিল্লা	৮০	—	৫	১	—	—	—	৮৬
নোয়াখালী	৪৩	—	২	—	—	—	—	৪৫
খুলনা	৬৫	১	২	—	—	—	—	৬৮
যশোর	৯১	—	৪	২	—	—	—	৯৭
বরিশাল	৭৫	—	—	—	—	—	—	৭৫
পটুয়াখালী	৪	—	—	—	—	—	—	৪
কুষ্টিয়া	৪৫	—	—	—	—	—	—	৪৫
রাজশাহী	৫৪	১	৫	—	—	১	—	৬১
রংপুর	৭২	—	৪	—	—	—	—	৭৬
দিনাজপুর	৬১	—	২	—	—	—	—	৬৩
বগুড়া	২৬	—	২	—	—	—	—	২৮
পাবনা	৫৩	—	২	—	—	—	—	৫৫
মোট	৯৯১	১৩	৪২	৪৯	৯	৫	২	১১১১

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪৬ **বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান**

১। ১৯৪৭ সালে প্রণীত আইন অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়-[য. বো. ২০১৬]

ক. একটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়

খ. একটি গণপরিষদ গঠিত হয়

গ. ১০ সদস্যবিশিষ্ট একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়

ঘ. বিচারপতিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়

২। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের প্রথম অস্থায়ী সভাপতি কে ছিলেন? [দি. বো. ২০১৯]

ক. যোগেন্দ্র নাথ মণ্ডল

খ. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

গ. তমিজ উদ্দিন খান

ঘ. গোলাম মোহাম্মদ

৩। ১৯৪৮ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হন কে?

ক. মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ

খ. লিয়াকত আলী খান

গ. খাজা নাজিমুদ্দিন

ঘ. তমিজ উদ্দিন খান

৪। "বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার আদেশ" জারি করা হয়- [দি. বো. ২০২২]

ক. ২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল

খ. ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল

গ. ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সাল

ঘ. ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সাল

৫। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদে পূর্ববাংলার সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল?

[রা. বো. ২০২৩; ২০১৬]

ক. ৪২

খ. ৪৩

গ. ৪৪

ঘ. ৪৫

৬। উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করার দাবি উত্থাপন করেন কোন্ গণপরিষদ সদস্য? [ঢা. বো. ২০২১, ২০১৯; রা. বো. ২০২২, ২০১৯, ২০১৬; সি. বো. ২০২২]

ক. শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক

খ. হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী

গ. ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ঘ. যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

৭. ১৯৫২ সালে পাকিস্তানের শতকরা কতজন লোকের ভাষা ছিল বাংলা? [সি. বো. ২০২২; ঢা. বো. ২০১৬]

ক. ৫৬.৪০%

খ. ২৮.৫৫%

গ. ৫.৪৮

ঘ. ৩.৩৭

৮। পাকিস্তানের শতকরা কতভাগ লোকের ভাষা ছিল উর্দু? [ঢা. বো. ২০১৯]

ক. ৩.২৭

খ. ১৩.১৭

গ. ৩৪.৪০

ঘ. ৪৪.১২

৯। পাকিস্তানের মোট কত শতাংশ লোকের বসবাস ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে? [দি. বো. ২০১৭]

ক. ৫৪%

খ. ৪৪%

গ. ৫৬%

ঘ. ৫৫%

১০। কোন্ তারিখে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়? [রা. বো. ২০১৯]

ক. ১ আগস্ট, ১৯৪৭

খ. ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

গ. ১ আগস্ট, ১৯৪৮

ঘ. ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮

১১। কাঁর নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' গঠন করা হয়? [য. বো. ২০২১]

ক. শেখ মুজিবুর রহমান

খ. অধ্যাপক আবুল কাশেম

গ. মোতাহার হোসেন

ঘ. আবুল মনসুর আহমেদ

১২। কাঁর নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সংগঠন 'তমদ্দুন মজলিস' গঠিত হয়?

[চ. বো. ২০২১; ব. বো. ২০১৬;

ক. অধ্যাপক আবুল কাশেম

খ. অধ্যাপক ইউসুফ

গ. অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ

ঘ. অধ্যাপক মনিরুজ্জামান

THANK YOU

HSC একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০২ – পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ (১৯৪৭-১৯৭১)

টপিক – ৪৭ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' রাষ্ট্রের স্বাধীনতার পর থেকেই শাসকগোষ্ঠী রাষ্ট্রের একটি অঞ্চলের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ শুরু করে। শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয় এবং একপর্যায়ে জনগণের প্রিয় নেতা শাসকগোষ্ঠীর কাছে কিছু দাবি উত্থাপন করেন।

[ঢা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. ছয়-দফার প্রথম দফা উল্লেখ করো।

খ. যুক্তফ্রন্ট কেন গঠিত হয়েছিল? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকের সাথে তোমার পঠিত কোন প্রাদেশিক নির্বাচনের সাদৃশ্য আছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নির্বাচনের বিজয় ছিল মূলত বাঙালির জাতীয়তাবোধের বিজয়-বিশ্লেষণ করো।

পাকিস্তান আমলের একটি বিয়োগান্তক ঘটনাকে উপজীব্য করে রচিত হয় কবিতা- 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি', সঙ্গীত-'ওরা আমার মুখের ভাষা কাইরা নিতে চায়, তোরা ঢাকা শহর রক্তে ভাসাইলি', উপন্যাস-'আরেক ফাল্গুন', নাটক-'কবর'। রচনাসমূহ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি বিয়োগাত্মক ঘটনার ফলে সৃষ্ট বাঙালির অদম্য চেতনাকে করেছে সুসংগঠিত ও শক্তিশালী। এর ধারাবাহিকতায় আরো কয়েকটি সফল রাজনৈতিক কর্মসূচির চূড়ান্ত পরিণতি হলো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ। [কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামির সংখ্যা কত ছিল?

খ. অপারেশন সার্চলাইট কী?

গ. উদ্দীপকের রচনাসমূহ তোমার পঠিত যে বিয়োগান্তক ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার পটভূমি ব্যাখ্যা করো।

ঘ. স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে উদ্দীপকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ঘটনাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

জাতীয়তা একটি মানসিক ধারণা। একই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য কিংবা ভৌগোলিক সান্নিধ্যতার সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্য জনসমষ্টি হতে আলাদা মনে করে তখন সেই জনসমষ্টিকে জাতীয়তা বলে। ১৯৫২ সালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটায় এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে।

[রা. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. কত সালে পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি করা হয়?

খ. যুক্তফ্রন্ট কী? ব্যাখ্যা করো।

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি তোমার পঠিত কোন বিষয়কে নির্দেশ করেছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. উক্ত আন্দোলনটি অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করে-বিশ্লেষণ করো।

THANK YOU